পথে ও পথের প্রান্তে

পত্রধারা—৩

পথে ও পথের প্রান্তে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্নওআলিস্ স্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
২১০ কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা।

পথে ও পথের প্রান্তে

প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ সাল।

মূল্য এক টাকা।

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

পৃথিবী আপনাকে প্রকাশ করে দু'রকমের চলন দিয়ে। একটা চলন তার নিজেকে ঘিরে ঘিরে—আর একটা চলন বড়ো যাত্রাপথে, সূর্যের চারদিকে। পৃথিবীর বর্ষচক্রমণ্ডলে দেখা দেয় তার ঋতুপর্যায়, নানা জাতের ফল ফসলের ডালি ভরে ওঠে, সর্বজনের পণ্যশালায়। আর তার দিনযাত্রায় দেখা যায় জলে স্থলে আলো ছায়ার ইশারা, আকাশে আকাশে প্রকৃতির মেজাজ বদল, সকাল সন্ধ্যার দিক্‌সীমানায় রঙের খেয়াল, ঘুম জাগরণের আনাগোনার পথে নানা কণ্ঠের কলকাকলী।

পৃথিবীর এই দুই শ্রেণীর প্রদক্ষিণের সঙ্গে তুলনা করা চলে সর্বজনের দরবারে সাধারণ সাহিত্যের আর অন্তরঙ্গ মহলে চিঠির সাহিত্যের গতিবিধির। সাধারণ সাহিত্যকে টানে বিরাট পাঠককেন্দ্র, চালায় দূর দেশ দূরকালের পথে ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে। আর চিঠির সাহিত্যে ধরা দেয় লেখকের কাছঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি প্রতিধ্বনি, তার ক্ষণিক হাওয়ার মর্জি আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদ্যপ্রত্যক্ষ সংসার পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ। অন্তত যে চিঠিগুলি এই পত্রধারায় প্রকাশ করা হোলো তাদের সম্বন্ধে একথা অনেকখানি সত্য।

পত্রধারার "ছিন্নপত্র" পর্যায়ে যে চিঠির টুকরোগুলি ছাপানো হয়েছে তার অধিকাংশই আমার ভাইঝি ইন্দিরাকে লেখা চিঠির থেকে নেওয়া। তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, আমার পথচলা মনে সেই সকল গ্রাম-দৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল; তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে। কথা কওয়ার অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, কোথাও কৌতুক কৌতূহলের একটু ধাক্কা পেলেই তাদের মুখ খুলে যায়। যে বকুনি জেগে উঠতে চায় তাকে টেঁকসই পণ্যের প্যাকেটে সাহিত্যের বড়ো হাটে চালান করবার উদ্যোগ করলে তার স্বাদের বদল হয়। চার-দিকের বিশ্বের সঙ্গে নানা কিছু নিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় আমাদের মোকাবিলা চলছেই, লাউড স্পীকারে চড়িয়ে তাকে ব্রডকাস্ট করা সয় না। ভিড়ের আড়ালে চেনালোকের মোকা-বিলাতেই তার সহজরূপ রক্ষা হোতে পারে।

পত্রধারার দ্বিতীয় পর্যায়ের চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল একটি বালিকাকে। সে চিঠির বেশির ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্যে দিয়ে স্বতই বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি। এগুলিতে মোটা সংবাদ বেশি কিছু নেই, হাসিতামাশায় মিশিয়ে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস; আর তারি সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ। বিশেষ কিছু বলতে হবে না মনে করে হাল্‌কা মনে আটপৌরে রীতিতে যা বলা যেতে পারে

তাকে কোনো শান-বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই।

পত্রধারার তৃতীয় পর্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে "পথে ও পথের প্রান্তে।" তার একটু ইতিহাস আছে। সেবার যখন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম সেখানকার নানা দেশে আমার ডাক পড়েছিল। তখন অসুস্থদশায় রথীন্দ্রনাথ বন্দী ছিলেন বার্লিনে আরোগ্যশালায়। তাই আমার সাহচর্যের ভার পড়েছিল প্রশান্ত মহলানবিশের পরে, তাঁর স্ত্রী রাণী ছিলেন তাঁর সঙ্গে। সমস্ত ভার বিনা বাক্যে কখনো বা প্রবল বাক্যব্যয়ে তিনিই নিয়েছিলেন নিজের হাতে। ভ্রমণ-কালীন ব্যবস্থার কাজে পুরুষ দুজনের অঘটন-ঘটানো অপটুতা সংশোধন করে চলতে হয়েছিল তাঁকে। জিনিসপত্র বাঁধা ছাঁদা, গোছগাছ করা, বস্তুপুঞ্জ হিসাব করে রাখা, সামলিয়ে নিয়ে বেড়ানো, বিদেশী কর্তৃমহলে নিষ্পরোয়ায় অযথা বা যথোচিত দাবি দাওয়া করায় ঐ কয়েক মাসে রাণীর অসামান্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে। নতুন নতুন রেলের কামরায়, জাহাজের ক্যাবিনে, হোটেলের প্রকোষ্ঠে, বারবার ব্যবস্থা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে ব্যবহার করে চলেছি; তার নানা প্রকার অভাবনীয় সমস্যাসমাধানের ভার তাঁর হাতে দিয়ে নির্লজ্জ নিশ্চিন্ত মনে অজস্র সেবা-শুশ্রূষায় দিন কাটিয়েছিলেম। অবশেষে য়ুরোপে ভ্রমণের পালা শেষ করে যখন আমরা গ্রীসের বন্দর থেকে ঘরমুখো জাহাজে চড়ে বেরিয়ে পড়লুম তাঁরা রয়ে গেলেন বিদেশে।

তখন তাঁদের সাহচর্যে-গাঁথা পথযাত্রার ছিন্নসূত্রকে যে সব চিঠির দ্বারা জুড়তে জুড়তে চলে ছিলুম দেশের দিকে, সেই গুলি ও তারই পরবর্তী কালের চিঠিগুলি পত্রধারার তৃতীয় পর্যায়ে সংকলিত হোলো। কিছুকাল ধরে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিরন্তর যে তর্কবিতর্ক আলোচনা চলেছিল তারই বাক্যালাপের বেগ এই চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপভ্রমণের বৃত্তান্ত যা কোথাও প্রকাশ পেল না তার দাম খুব বেশি।

যে সকল চিন্তা ও চেষ্টার অনুষঙ্গে বলবার বিশেষ বিষয় মনের মধ্যে মথিত হয় ও রচনার মধ্যে দানা বাঁধে তাদের উপলক্ষ্য জীবনান্ত কাল পর্যন্ত থাকে। কিন্তু মানসিক জীবনে যে স্রোতাবেগে চলার সঙ্গে সঙ্গে বলা আপনি মুখরিত হয়ে ওঠে একদিন তার একটা অবসন্নতা বা অবসান আছে। ভরতি মনের অবস্থায় জরুরি কথা ছাপিয়েও উদ্বৃত্ত থাকে মুখরতা। যাঁরা মজলিসি স্বভাবের লোক তাঁদের সেই উদ্বৃত্ত প্রকাশ পায় বৈঠকে, যাঁরা অন্তর্নিবিষ্ট তাঁরা স্বগত উক্তি লেখেন ডায়ারিতে, আমার মতো যাঁদের রচনায় মৌতাত তাঁরা বকুনি চালান করেন এমন কারোর কাছে যাঁদের দিকে চিঠির রাস্তা সহজ হয়ে গেছে। অবশেষে মনটা এমন অবস্থায় এসে ঠেকে যখন উদ্বৃত্তের উদ্বেলতা তটসীমার নিচে তলিয়ে যায়, জীবন নদীতে চলার ধারায় বলার কল্লোল মরে আসে। আজ কাছে এসেছে আমার সেই ধ্বনিহীনতার বয়েস, স্বেচ্ছারচিত চিঠি লেখার দিন গেছে পেরিয়ে ;—

আমার যে চিঠিগুলো অনাবশ্যক একদিন ছড়িয়ে পড়ছিল সমুদ্রের ধারে রং বেরঙের ঝিনুক শামুকের মতো, বাইরের পাঠকদের মতোই আমি তাদের কৌতূহলের চোখে দূরের থেকে দেখছি। এখনকার বিরলভাষার মন তখনকার প্লাবন-ধারার মনের প্রতি যে ঈর্ষা করছে তার সঙ্গে কিছু আনন্দেরও রেশ আছে। যখন ফসল ফলা শেষ হয়ে যায় তখন থেকে শস্য সংগ্রহ ক'রে গোলায় তোলবার সময় আসে, আজ সেদিনকার বাণীমুখর ঋতুর ফসল গোলায় তোলা গেল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

আমরা ছিলুম অস্তসূর্যের শেষ আলোয়, তোমরা ছিলে ঘাটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল, ক্রমে আড়াল পড়ল, বস্তুর আড়াল। ফিরলুম সেই ক্যাবিনে—মনে পড়ে ক্যাবিনটা? মনে রাখবার মতো কিছুই না, দুদিনের বাসা। যেখানে আমরা পাকা ক'রে বাসা বাঁধি সেখানে বাসার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধস্মৃতি জড়িয়ে যায়—কিন্তু পথে চলতে চলতে পান্থশালার সঙ্গে কোনো গ্রন্থি বাঁধে না—স্রোতের শৈবাল যেমন নদীর বাঁকে বাঁকে ক্ষণকালের জন্যে ঠেকতে ঠেকতে যায় তেমনি আর কি। তবু পথিক-জীবনের পথচলা প্রবাহের মধ্যেও অনেক কথা মনের মধ্যে জড়িয়ে থাকে। প্রতিদিন তুমি নিজের হাতে সেবাযত্ন করেছিলে—কখন আমি কী পরি কখন আমার কী চাই সমস্ত তুমি জেনে নিয়েছিলে, তারপরে পথে পথে সমস্ত জিনিসপত্র তোমার হাতে বাঁধা আর খোলা। এ সবগুলো অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল—সেই অভ্যেসটা এক দিনের মধ্যেই হঠাৎ আপন ছয়মাসব্যাপী প্রতিদিনের দাবি থেকে বঞ্চিত হয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

এখনো প্রায় তিন হপ্তার পথ বাকি আছে। তারপরে শান্তিনিকেতন। আমার কেবলি মনে হচ্ছে সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্যোদয়ের পথে যাত্রা করেছি। যে পর্যন্ত না পৌঁছই, সে-পর্যন্ত বেদনা। দিনের পর দিন, ঘটনার পর ঘটনা যখন বাইরে থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে আসে তখন বুঝতে পারি আপনার সত্যকে পাইনি। তখনই এই বাইরের আঘাতগুলো ক্রোধ লোভ মোহের তুফান তোলে। অন্তরের মধ্যে এই সমস্ত বহির্ব্যাপারের একটা কেন্দ্র খুঁজে পেলে তখন নিখিলের মহান ঐক্য নিজের ভিতর একান্তভাবে বুঝতে পারি—তাকেই বলে মুক্তি—প্রতিদিনের প্রতিজিনিসের প্রতি ঘটনার খাপছাড়া বিচ্ছিন্নতার থেকে মুক্তি। এই মুক্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি। ইতি ২৬ নভেম্বর, ১৯২৬; জাহাজ।

২

নিজেকে বিশেষ কোনো একজন মনে করতে আজও পারিনে—এ সম্বন্ধে আমার স্বদেশের অনেক লোকের সঙ্গেই আমার মতের মিল হয়। আমার অন্তরলোকে কোনো একটা অগমস্থানে একজন কেউ বাস করে—সে কোথা থেকে কথা কয়—সে-কথার মূল্যও আছে কিন্তু আমিই যে সে, তা ভাবতেও পারিনে—আমার মধ্যে তার বাসা আছে এই পর্যন্ত। যে-আমি প্রত্যক্ষগোচর সে নিতান্তই বাজে লোক—তাকে সহ্য করা শক্ত, বন্দনা করা দূরের কথা। তাকে কোনো রকম ক'রে তফাতে সরিয়ে দিতে পারলে তবেই আমার অন্তরতর মানুষটির মান রক্ষা হয়। সেই চেষ্টায় আছি।

এ জায়গায় অনেক দেখবার আছে। আমি তেমন দেখনেওয়ালা নই এই দুঃখ। কিন্তু তবু ম্যুজিয়মে যাবার লোভ সামলাতে পারি নি। দেখবার এত জিনিস খুব অল্প জায়গায় পাওয়া যায়। একটা ব্যাপার এখানে খুব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে—গ্রীসের যে পার্থেনন্ গ্রীসের স্বকীয় কীর্তি ব'লে এতদিন চলে এসেছে সেই পার্থেননের মূল প্রতিরূপ ইজিপ্টের ভূগর্ভে পাওয়া গেছে। যে-স্থপতি এই রীতির স্তম্ভ প্রথম তৈরি করেছিলেন অতি প্রাচীন ইজিপ্টে তিনি

একজন অসামান্য রূপকার ব'লে পূজা পেয়েছিলেন। গ্রীকরা তাঁরই কাজের অনুকরণে নিজেদের মন্দির নির্মাণ করেছিল। এই ব্যাপার নিয়ে আরও অনেক মাটি ও মাথা খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। মানুষ যে কত সুদূর যুগেও আপন প্রতিভা প্রকাশ করেছে তা ভাবলে আশ্চর্য হোতে হয়। কত অজানা সভ্যতার কত বিচিত্র গৌরব মাটির নিচে সমুদ্রের তলায় সর্বভুক কালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তারই বা ঠিকানা কে জানে। আমাদের কাহিনীও একদিন লুপ্ত ইতিহাসের নিচের তলায় কবে অদৃশ্য হয়ে যাবে। যতদিন উপরের আলোতে আছি ততদিন কিছু গোলমাল করা গেল—সম্পূর্ণ চুপচাপ করবার সুদীর্ঘ সময় সামনে আছে। ইতি ২ ডিসেম্বর, ১৯২৬।

৩

কাল সুয়েজে এসে খবর পেলুম যে, সন্তোষ মারা গেছে। মৃত্যুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যে এত কঠিন তার কারণ অন্যের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমি আছি, অথচ আর যে-একজন আমার সঙ্গে এমন একান্ত মিলিত ছিল সে একেবারেই নেই এমন বিরুদ্ধ কথা ঠিকমতো মনে করাই শক্ত। আমরা নিজেকে অনেকখানি পাই অন্যের মধ্যে—সন্তোষ সেই তাদেরই মধ্যে অন্যতম ছিল। আমার জীবনের একটা বিভাগ, সকলের চেয়ে বড়ো ও সত্য বিভাগ—তাকে নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল। আমার মনে হচ্ছে সেইখানে যেন ফাঁক প'ড়ে গেল। সন্তোষের প্রতি আমার একটি যথার্থ নির্ভর ছিল কেননা আমার গৌরবে সে একান্ত গৌরব বোধ করত—আমার প্রতি কোনো আঘাত তার নিজের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো আঘাত ছিল। যে-একজন ব্যক্তি বাইরের দিক থেকে শ্রদ্ধার দ্বারা আমাকে ডাক দিতে পারত সে রইল না। ইতি. ৫ ডিসেম্বর, ১৯২৬।

৪

ভেবেছিলুম জাহাজ এডেনে দাঁড়াবে তখন তোমার চিঠি ডাকে দেব। খবর পেলুম সুয়েজ থেকে কলম্বোর মধ্যে জাহাজ কোথাও দাঁড়াবে না। তাই ভাবছি আরও একটুখানি লিখি।

মৃত্যুর কথাটা মন থেকে কিছুতে যাচ্ছে না। আমাদের আপন সংসারের প্রত্যেককে নিয়ে বিশেষ কোনো-না-কোনো আমিই বিস্তৃত হয়ে আছি— কোথাও গভীর কোথাও অগভীরভাবে। সেই সবটা নিয়েই আমার জীবন। বিশ্বজগতে আমার প্রায় কোনো কিছুতেই ঔদাসীন্য নেই, তার মানে আমি খুব ব্যাপকভাবে বেঁচে আছি। কিন্তু যত ব্যাপ্তি তত তার আনন্দও যেমন দুঃখও তেমনি। প্রাণের পরিধি যেখানে প্রসারিত মৃত্যুর বাণ সেখানে নানা জায়গায় এসে বিদ্ধ হবার জায়গা পায়। জীবনের সত্য সাধনা হচ্ছে অমরতার সাধনা, অর্থাৎ এমন কিছুতে বাঁচা যা মৃত্যুর অতীত। অনেক সময় প্রিয়জনের মৃত্যুতে-যে বৈরাগ্য আনে তার মানে হচ্ছে এই যে, তখন আহত প্রাণ সব ত্যাগ ক'রে এমন কিছুতে বাঁচতে চায় যার ক্ষয় নেই বিলুপ্তি নেই। পিতৃদেবের জীবনীর প্রথম অধ্যায়ে সেই কথাটাই পাই। মৃত্যু যখন জীবনের

সামনে আসে তখন এই কথাটাই প্রশ্ন করে, "আমি যা নিলুম তার ভিতরকার কিছু কি বাকি আছে। কিছুই যদি বাকি না থাকে তাহলে সম্পূর্ণ ঠকেছ।" প্রাণ প্রাণকেই চায়, সে কোনোমতেই মৃত্যুর দ্বারা ঠক্‌তে চায় না—যেই ঠিকমতো বুঝতে পারে ঠকেছি, অমনি সে ব্যাকুল হয়ে ব'লে ওঠে "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।" মানুষ কতবার এই কথা বলে আর কতবার এই কথা ভোলে। ইতি ৭ ডিসেম্বর, ১৯২৬।

৫

কিছু খবর দেবার চেষ্টা করব। নইলে চিঠি বেশি ভারি হয়ে পড়ে। অনেকদিন থেকে চিঠিতে খবর চালান দেবার অভ্যাস চলে গেছে। এটা একটা ত্রুটি। কেননা আমরা খবরের মধ্যেই বাস করি। যদি তোমাদের কাছে থাকতুম তাহলে তোমরা আমাকে নানাবিধ খবরের মধ্যেই দেখতে, কী হোলো এবং কে এল এবং কী করলুম এইগুলোর মধ্যে গেঁথে নিয়ে তবে আমাকে স্পষ্ট ধরতে পারা যায়। চিঠির প্রধান কাজ হচ্ছে সেই গাঁথন সূত্রটিকে যথাসম্ভব অবিচ্ছিন্ন করে রাখা। আমি-যে বেঁচে বর্তে আছি সেটা হোলো একটা সাধারণ তথ্য—কিন্তু সেই আমার থাকার সঙ্গে আমার চারিদিকের বিচিত্র যোগবিয়োগের ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারাই আমি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষগোচর। এইজন্যেই চিঠিতে খবর দিতে হয়—দূরে থাকলে পরস্পরের মধ্যে সেই প্রত্যক্ষতাকে চালাচালি করবার দরকার হয়। প্রয়োজনটা বুঝি কিন্তু সত্যকার চিঠিলেখার যে আর্ট সেটা খুইয়ে বসে আছি। তার কারণ হচ্ছে কাছের মানুষ আমাকে আমার চারিদিকের নব নব ব্যাপারের সঙ্গে মিলিয়ে যেমন করে দেখতে পায়, আমি নিজেকে তেমন করে দেখিনে। অন্যমনস্ক স্বভাবের জন্যে আমি চারিদিককে বড়ো বেশি বাদ দিয়ে ফেলি। সেইজন্যে যা ঘটে

তা পরক্ষণেই ভুলে যাই—ঐতিহাসিকের মতো ঘটনাগুলিকে দেশকালের সঙ্গে গেঁথে রাখতে পারিনে। তার মুশকিল আছে। তোমরা কেউ যখন আমার সম্বন্ধে কোনো নালিশ উপস্থিত করো তখন তোমাদের পক্ষের প্রমাণগুলোকে বেশ সুসম্বদ্ধ সাজিয়ে ধরতে পারো—আমার পক্ষের প্রমাণগুলো দেখি আমার আনমনা চিত্তের নানা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমি কেবল আমার ধারণা উপস্থিত করতে পারি। কিন্তু ধারণা জিনিসটা বহুবিস্মৃত প্রমাণের সম্মিলনে তৈরি। সে প্রমাণগুলোকে সপিনে দিয়ে সাক্ষ্যমঞ্চে আনা যায় না। যাদের ধারণাগুলো শনিগ্রহের মতো বহু প্রমাণমণ্ডলের দ্বারা সর্বদাই পরিবেষ্টিত তাদের ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার ঠোকাঠুকি হোলে আমার পক্ষেই দুর্বিপাক ঘটে।

কিন্তু খবর সম্বন্ধে এতক্ষণ যে তত্ত্বালোচনা করলুম তাকে খবর বলা যায় না। কী দিয়ে আরম্ভ করব সেই কথা ভাবছি। আলেকজান্দ্রিয়ার থেকে খবরের ধারার মধ্যে এসে পড়েছি। যাঁরা আমার ইজিপ্টের পালা জমাবার ভার নিয়েছিলেন তাঁরা ইটালিয়ান, নাম "সোয়ারেস্", ধনী ব্যাঙ্কার। আমাকে তাঁদের যে বাগানবাড়িতে রেখেছিলেন সে অতি সুন্দর। সে বারান্দাগুলো খুব দিলদরিয়া গোছের—একদিকে বাগান, আর-একদিকে নীল সমুদ্র, আকাশ মেঘশূন্য, সূর্যের আলোয় শ্যামল পৃথিবী ঝলমল করছে, সমস্তদিন নিস্তব্ধ নির্জন অবকাশের অভাব ছিল না। যেদিন সকালে পৌঁছলুম তার পরদিন সায়াহ্নে বক্তৃতা, সুতরাং মনটা গভীর বিশ্রামের মধ্যে

অনেকক্ষণ তলিয়ে থাকতে পেরেছিল। সেইজন্যেই বক্তৃতাটি অতি সহজেই পাকা ফলের মতো বর্ণে গন্ধে রসে বেশ টস্‌টসে হয়ে উঠতে পেরেছিল। পরদিন কায়রোর পালা। ঘণ্টা চারেক গেল রেলগাড়িতে। এবার হোটেল। হোটেল বলতে কী বোঝায় এবার তা তোমার খুব ভালো করেই জানা আছে। খুব বড়ো হোটেল—খুব মস্ত খাঁচা। পৌঁছলেম মধ্যাহ্নে। বৈকালেই সেখানকার সর্বোত্তম আরবি কবির বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ। কবির নিমন্ত্রণ ছাড়া এই নিমন্ত্রণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, সেখানে ইজিপ্টের সমস্ত রাষ্ট্রনায়কের দল উপস্থিত ছিলেন। পাঁচটার সময় পার্লামেণ্ট বসবার সময়। আমার খাতিরে একঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে জানানো হোলো এমন ব্যবস্থা বিপর্যয় আর কখনো আর কারো জন্যে হোতে পারত না। বস্তুত এটা আমাকে সম্মান দেখাবার একটা অসামান্য প্রণালী উদ্ভাবন করা। আমি বললেম, এ হচ্ছে বিদ্যার কাছে রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রণতি, এ কেবলমাত্র প্রাচ্যদেশেই সম্ভবপর। ওখানে কানুন ও বেহালা যন্ত্রযোগে আরবি গান শোনা গেল—স্পষ্টই বোঝা গেল ভারতের সঙ্গে আরব পারস্যের রাগরাগিণীর লেন্‌ দেন্‌ এক সময় খুবই চলেছিল। মণ্টুকে বলব ইজিপ্টে এসে যেন সে এই তথ্যের গবেষণা করে। যখন ছুটি পেলুম তখন সমস্ত দিনের ক্লান্তির ভূত আমার মেরুদণ্ডের উপর চেপে বসেছে, তার উপরে একটা অত্যুগ্র অজীর্ণ পীড়া আমার পাকযন্ত্রের মধ্যে বিপাক বাধিয়েছে। পাকযন্ত্রের কোনো অপরাধ ছিল না। প্রথমত

রুমানিয়ান্ জাহাজে যা খাদ্য ছিল তা পথ্য ছিল না, দ্বিতীয়ত সোয়ারেসের বাড়িতে যে ভোজের ব্যবস্থা ছিল সেটাও ছিল অভ্যাস-বিরুদ্ধ এবং গুরুপাক। এমন অবস্থায় ক্লান্তি ও ব্যাধি নিয়ে যখন বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়ালুম তখন আমার মন কোনোমতে কথা কইতে চাচ্ছিল না। পালে হাওয়া ছিল না, কেবলি লগি মারতে হোলো। স্পষ্টই বুঝতে পারছিলুম পাড়ি জমছে না। যা হোক কোনোমতে ঘাটে পৌঁছনো গেল। সেটা কেবল আবৃত্তির জোরে। সুইডেনের সেই মিনিস্টার ছিলেন, বক্তৃতা তাঁর ভালো লেগেছিল বললেন। যে-মেয়ের পাত্র জোটা সহজ নয় যখন দেখি তারো বেশ ভালো বিয়ে হয়ে গেল তখন যে-রকম মনে হয় এঁর মুখে প্রশংসা শুনে আমার সেই রকম মনের ভাব হোলো। ইনি যদি য়ুরোপের উত্তর দেশের লোক না হতেন তাহলে মনে করতে পারতেম কথাটা অকৃত্রিম নয়। পরদিন ম্যুজিয়ম দেখতে গিয়েছিলেম —দেখবার জায়গা বটে, তার বর্ণনা করতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। ফেরবার পথে তোমরা নিজেরাই দেখে যাবে— তোমাদের সেই স্বচক্ষের উপরেই বরাত দিয়েই চুপ করা গেল। এই সব কীর্তি দেখে মনে মনে ভাবি যে, বাইরের মানুষ সাড়ে তিন হাত কিন্তু ভিতরে সে কত প্রকাণ্ড।

এখানকার রাজার সঙ্গেও দেখা হোলো। তাঁকে বললেম য়ুরোপের অনেক রাজ্য থেকে বিশ্বভারতী অনেক গ্রন্থ উপহার পেয়েছেন ; আরবি সাহিত্য সম্বন্ধে য়ুরোপে যে সব ভালো বই বেরিয়েছে যদি তদীয় মহিমা তা আমাদের দিতে পারেন

তাহলে রাজোচিত বদান্যতা দেখানো হবে। তদীয় মহিমা খুব উৎসাহের সঙ্গেই রাজি হয়েছেন।

ইতি মধ্যে মিস্ প—অবাধে অক্ষুন্ন শরীরে আমাদের দলে এসে ভিড়েছেন। হোটেলের বাইরে খোলা পৃথিবী থাকে, জাহাজের বাইরে মানুষের যোগ্যস্থান নেই। এই জন্যে সকল দলের লোকের সঙ্গে খুব ঘেঁষাঘেঁষি অনিবার্য। তাতেও নতুন মানুষ যে ঠিক কী তা জানা যায় না বটে কিন্তু কী নয় তা অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। প্রথমত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এঁর কিছুই জানা নেই এবং উৎসুক্য আকর্ষণ নেই। বুদ্ধিগম্য বিষয় সম্বন্ধেও কোনো অনুরক্তি দেখা গেল না।—সাদা কথার একটুমাত্র বাইরে গেলেই ওর পক্ষে ডুব জল হয়ে পড়ে।

মনে কোরো না, আমি কোনো সিদ্ধান্ত মনের ভিতর এঁটে বসে আছি। সিদ্ধান্ত দ্বারা মানুষের প্রতি অবিচার করার আশঙ্কা আছে। জন্তুরা তাদের অন্ধ সংস্কার থেকে ভয় পায়, সন্দেহ করে। প্রকৃতি তাদের বিচার করতে দেননি, বিচারে যতগুলো প্রমাণের দরকার হয়, তা সংগ্রহ করতে সময় লাগে—ইতিমধ্যে বিপদ এসে পড়ে—যেটা চূড়ান্ত প্রমাণ সেইটেই চূড়ান্ত বিপদ। হরিণ শব্দমাত্র শুনলেই অন্ধসংস্কারের তাড়ায় দৌড় মারে—শব্দটা ঝোপের ভিতরকার বাঘের কাছ থেকে এল কি না তার নিঃসংশয় প্রমাণ নিতে গেলে বাঘ এবং প্রমাণ ঠিক এক সঙ্গেই এসে পড়ে। মানুষ যখন কোনো কারণে বিষম সংকটের অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ যখন খুব তাড়া-

তাড়ি মন স্থির করা অত্যাবশ্যক, মানুষেরও তখন হাঁ… অবস্থা হয়। পৃথিবীতে যে সব-জাত নিজেদের সম্বন্ধে যথোচিত নিরাপদ ব্যবস্থা করতে পেরেছে, যাদের আইন যথোচিত পাকা, যাদের আত্মরক্ষাবিধি সুবিহিত তারা অন্ধ সংশয়ের হাত থেকে বেঁচেছে—কেননা ওটা তাদের পক্ষে সহায় নয়, বাধা।

ওর (Miss P—এর) জীবনে বিস্তর ভাঙাচোরা ঘটেছে—এদিকে ওদিকে অনেক ব্যথা অনেক আকারে ওর মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। ও মনে করেছে আমি বুঝি কোনো একরকম ক'রে ওকে সাহায্য করতে পারি। কেননা ও অনেকের কাছে শুনেছে-যে আমি তাদের সাহায্য করেছি। অথচ আমি যে কোথায় সত্য, কোথায় আমার সম্পদ, তা ও জানে না, বুঝতেও পারে না। ও মনে করেছে আমার কাছাকাছি থাকার মধ্যেই বুঝি সাহায্য ব'লে একটা পদার্থ আছে। বুঝতে পারে না কাছাকাছি যাকে প্রত্যহ পাওয়া যায় সে অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি, অনেক বিষয়ে সে নির্বোধ, অনেক বিষয়ে সে মন্দ। আসল কথা ও স্ত্রীলোক। আঁকড়ে থাকলেই একটা সত্য বস্তু পাওয়া যায় ব'লে ওর ধারণা। হায়রে পৌত্তলিক। প্রতিমার মাটি সত্য নয়, তাকে যতই গয়না দিয়ে সাজাইনে কেন। অথচ প্রতিমার মধ্যে যে সত্য নেই এত বড়ো ঘোর ব্রাহ্মিক গোঁড়ামিও ঠিক নয়। আসল কথা তাকে আঁকড়ে ধরতে গেলেই ভুলটাকে ধরা হয়, তখনি সত্য দেয় দৌড়। যে-পোকা বইএর কাগজ কেটে খায়, সেই পৌত্তলিক, যে তাকে

ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দাবিতে আমরা প্রতিদিন যে কাজ করে থাকি তার কোনো উদ্বৃত্ত নেই, নিজের মধ্যেই তা শোষিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু এমন একটি সাধনার সঙ্গে সন্তোষের সমস্ত জীবন সম্পূর্ণ সম্মিলিত হয়ে ছিল যে-সাধনা তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনমণ্ডলের অনেক অতীত। তার শ্রদ্ধাপ্রদীপ্ত জীবনের সেই পরিণতির ছবিটি আমি খুব স্পষ্ট দেখছি, যেহেতু তার জীবন স্বচ্ছ ও সরল ছিল—তার মধ্যে উপাদানের বহুলতা ছিল না। তার সংসার এবং তার সাধনা, তার কর্ম্ম এবং আদর্শ একত্র মিলিত ছিল, তার অল্পকালের আয়ুটুকু নিয়ে সে যে তারি মধ্যে জীবন যাপন করে যেতে পেরেছে এ তার সৌভাগ্য। আমি যদি প্রমাণের দ্বারা সন্তোষকে জানতুম তাহলে ভুল জানতুম—আমি তাকে সম্পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা জানি। ভালবাসার দ্বারা সব সময়েই যে দৃষ্টির বিকৃতি ঘটে তা নয়, দৃষ্টির সম্পূর্ণতাও ঘটে। আমার বুদ্ধি প্রমাণকে অস্বীকার করে না, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি প্রত্যক্ষবোধকেও শ্রদ্ধা করে। দুইয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে একান্ত বিরোধও ঘটে তখনি রহস্য বড়ো কঠিন ও বড়ো দুঃখকর হয়ে ওঠে। স্বয়ং মৃত্যুর মধ্যেই এই বিরোধ আছে—আমাদের হৃদয়ের সহজ বোধ তাকে চরম ব'লে মানতে চায় না—কিন্তু বিরুদ্ধ প্রমাণের আর অন্ত নেই—এই দুই প্রতিপক্ষের টানাটানিতেই তো এত দুঃসহ বেদনা। আমার "যেতে নাহি দিব" কবিতাটি এই বেদনারই কবিতা।

আজ জাহাজের মধ্যশ্রেণীর যাত্রীদের দরবার নিয়ে

গোরা এসেছিল। এই অপরাহ্নে তারা আমার মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। যদি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হোত তাহলে হঠাৎ রাজি হতুম না—দ্বিতীয় শ্রেণীর মনুষ্যত্বের আবরণ অনেক হাল্‌কা,—সেখানে মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে যাবার সময় হয়ে এল।

৭

সমুদ্রে আজ নিয়ে আর চারদিন আছি। ১৬ই সকাল কলম্বো পৌঁছব। কিন্তু দেশে পৌঁছবার শান্তি পাব না। দীর্ঘ রেলযাত্রা নানা ভাগে বিচ্ছিন্ন। তারপরে পুপে যাকে বলতে শিখেছে “মালপত্র”, তার সংখ্যা বহু, তার আয়তন বিপুল এবং তার আধারগুলির অবস্থা শোকাবহ। কোনো বাক্স আছে যাত্রার সূচনাতেই চাবির সঙ্গে যার চিরবিচ্ছেদ, দড়িদড়ার বন্ধন ছাড়া যার আর গতি নেই; কোনো বাক্স আছে যার সর্বাঙ্গ আঘাতে জর্জর, কোনো বাক্স আছে যা ভূরিভোজপীড়িত রোগীর মতো উদ্গারের দ্বারা ভার প্রশমনের জন্য উৎসুক—অথচ যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতালের রোগীর মতো এদের সম্বন্ধে রথীর উদ্বেগ সকরুণ। তা হোক তবুও দেশের মুখে চলেছি এবং দীর্ঘপথের সেই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন শেষ ভাগটা যেন দেখা যাচ্ছে। এখানে আমাদের দেশের সেই দাক্ষিণ্যপূর্ণ সূর্যালোক আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। শুক্ল-পক্ষের চাঁদ প্রতিদিন পূর্ণতর হয়ে উঠছে; আমাদের মর্মর-মুখরিত শালবীথিকার পল্লবপুঞ্জের মধ্যে তার দোললীলা মনে মনে দেখতে পাচ্ছি। প্রবাসবাসের সমস্ত বোঝা উত্তরায়ণের বহির্দ্বারে নামিয়ে দিয়ে আপন মনে স্বেচ্ছাবিহারের পালা অনতিবিলম্বে শুরু করব ব'লে কল্পনা করছি। কিন্তু

হায়, এও নিশ্চয় জানি যে, দেবলোকে আমাদের বাস নয়, যেখানেই থাকি না কেন। অনেকের অনেক ইচ্ছার ভিড় ঠেলে ঠেলে নিজের ইচ্ছার জন্য অতি সংকীর্ণ একটুখানি পথ পাওয়া যায়,—একটু সুবিধা এই যে, পথ সংকীর্ণ হোলেও সেটা অনেক কালের অভ্যস্ত পথ—ভিড়ের মধ্যেও খানিকটা আপন-মনে চলা সম্ভব।

আমাদের সহযাত্রীর মধ্যে একজন জর্মন নৃতত্ত্ববিদ সস্ত্রীক ভারতবর্ষে চলেছেন। তিনি আমাদের অধ্যাপকের নাম শুনেছেন। আমাকে বললেন—"শুনেছি তিনি ফিজিক্সের অধ্যাপনা করেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে তিনি নৃতত্ত্ব-বিদ্যার আঙ্কিক দিকটার চর্চা করেন; আমরা এর মানবিক দিকটা নিয়ে আছি।" মানবিক দিক বলতে যে কতখানি বোঝায় তা এঁর অধ্যবসায় দেখে একটু আন্দাজ করা যেতে পারে। দক্ষিণ ও মধ্যভারতের বন্যজাতিদের বিবরণ সংগ্রহ করতে চলেছেন, এ সব জাতদের বিষয় এখনো অজ্ঞাত ও দুর্জ্ঞেয়, আমি তো এদের নামও শুনিনি। এরা খুব দুর্গম জায়গায় প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। ইনি তাদের সেই প্রচ্ছন্নতার মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছেন। তাঁবুতে থাকলে পাছে তা'রা ভয় পায় সন্দেহ ক'রে একটা থলি নিয়েছেন; রাত্রে তারি মধ্যে থাকবেন। সাপ আছে, হিংস্র জন্তু আছে, অনিয়মে অপথ্যে ব্যাধির আশঙ্কা আছে। অর্থাৎ প্রাণ হাতে ক'রে নিয়ে চলেছেন। একটি শিশু সন্তানকে আত্মীয়ের হাতে রেখে এসেছেন। পাছে অরণ্যে স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন

এইজন্য সঙ্গ নিয়েছেন তাঁর স্ত্রী। ইতিমধ্যে ম্যাপ নিয়ে বই নিয়ে সমস্ত দিন নোট তৈরি করছেন, স্বামীর কাজ এগিয়ে দেবার জন্যে। যাদের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে দুঃসহ কষ্ট ও বিপদ অগ্রাহ্য ক'রে চলেছেন তারা আত্মীয়জাতি নয়, সভ্য-জাতি নয়, মানবজাতিসম্বন্ধীয় তথ্য ছাড়া তাদের কাছ থেকে আর কোনো দুর্মূল্য জিনিস আদায় করা যাবে না। এরা পৃথিবীর সমস্ত তথ্য ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বেরিয়েছে, আমরা পৃথিবীর মাটি জুড়ে ছেঁড়া মাদুর পেতে গড়াগড়ি দিচ্ছি। জায়গা ছেড়ে দেওয়াই ভালো—বিধাতা জায়গা সাফ করবার অনেক দূতও লাগিয়েছেন।

৮

কাল সকালে কলম্বো পৌঁছব। যখন য়ুরোপে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম আজকের এই দিনের ছবি অনেকদিন মনে মনে এঁকেছি জাহাজ এসেছে ভারতবর্ষের কাছাকাছি; উজ্জ্বল আকাশ বুক বাড়িয়ে দিয়েছে; শকুন্তলায়, বালক ভরত যেমন সিংহের কেশর ধরে খেলছে, শীতের নির্মল রৌদ্র তেমনি তরঙ্গিত নীল সমুদ্রকে নিয়ে ছেলেমানুষি করছে, আর সেই নারকেল গাছের ঘন বন, যেন দূরে থেকে ডাঙার হাত-তোলা ডাক। সেই কল্পনার ছবি এখন সামনে এসেছে। কাল লাক্কাডীভের খুব কাছ ঘেঁষে জাহাজ এল—শ্যামল তটভূমির কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলুম। ঐ তরুবেষ্টিত দিগন্তের ধারে মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা চলছে এই কথাটা যেন নতুন ও নিবিড় বিস্ময়ের সঙ্গে আমার মনে লাগল। আমি জানি যারা ঐখানে মাটি আঁকড়ে আছে তারা নিজে এর আনন্দ, এর সৌন্দর্য, এর মহার্ঘতা যে স্পষ্ট বুঝছে তা নয়। অভ্যাসে আমাদের চৈতন্যকে ম্লান ক'রে দেয়, কিন্তু তবু যা সত্য তা সত্যই। দূরের থেকে শান্তিনিকেতন আমার কাছে যতখানি, কাছের থেকে ঠিক ততখানি না হোতেও পারে—কিন্তু তার থেকে কী প্রমাণ হয়। দূরের দৃষ্টিতে যে-সমগ্রতা আমরা এক ক'রে দেখতে পাই সেইটাই বড়ো দেখা, কাছের দৃষ্টিতে যে

খুঁটিনাটিতে মন আবদ্ধ হয়ে সমষ্টিকে স্পষ্ট দেখতে দেয় না, সেইটেই আমাদের শক্তির অসম্পূর্ণতা। এই কারণেই, আমাদের সমস্ত আয়ু নিয়ে আমরা যে জীবনযাপন করেছি তাকে আমরা পুরোপুরি জানতেই পারিনে,—যা পাইনে তার জন্যে খুঁত খুঁত করি, যা হারিয়েছে তার জন্যে বিলাপ করি, এমনি করে যা পেয়েছি তার সবটাকে নিয়ে তাকে যাচাই করার অবকাশ পাইনে।) আসল কথা, শান্তিনিকেতনের আকাশ ও অবকাশে পরিবেষ্টিত আমাদের যে জীবন তার মধ্যে সত্যই একটি সম্পূর্ণরূপ আছে, যা কলকাতার সূত্রচ্ছিন্ন জীবনে নেই। সেই সম্পূর্ণরূপের অন্তর্গত নানা অভাব ও ত্রুটি তার পক্ষে ঐকান্তিক নয়, সেগুলো অপ্রাসঙ্গিক, পর্বতের গায়ের গর্তের মতো, যা পর্বতের উচ্চতাকে বৃথা প্রতিবাদ করে। শান্তিনিকেতনের ভিতর দিয়ে মোটের উপর আমি নিজেকে কী রকম ক'রে প্রকাশ করেছি সেইটের দ্বারাই প্রমাণ হয় শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে কী—মাঝে মাঝে কী রকম নালিশ করেছি, ছটফট করেছি তার দ্বারা নয়। শুধু আমি নই, শান্তিনিকেতনে অনেকেই আপন আপন সাধ্যমতো একটি সুসংগতির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছেন। এটা যে হয়েছে সে কেবল আমার জন্যেই হয়েছে এ কথা যদি বলি তাহলে অহংকারের মতো শুনতে হবে কিন্তু মিথ্যে বলা হবে না। আমি নিজের ইচ্ছার দ্বারা বা কর্মপ্রণালীর দ্বারা কাউকে অত্যন্ত আঁট করে বাঁধিনে ; তাতে ক'রে কোনো অসুবিধে হয় না তা বলিনে—

আমি নিজেই তার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছি কিন্তু তবু আমি মোটের উপর এইটে নিয়ে গৌরব করি। অধিকাংশ কর্মবীরই এর মধ্যে ডিসিপ্লিনের শিথিলতা দেখে—অর্থাৎ না-এর দিক থেকে, হাঁ-এর দিক থেকে দেখে না। স্বাধীনতা ও কর্মের সামঞ্জস্য সংঘটিত এই যে ব্যবস্থা এটি আমার একটি সৃষ্টি—আমার নিজের স্বভাব থেকে এর উদ্ভব। আমি যখন বিদায় নেব, যখন থাকবে সংসদ, পরিষদ ও নিয়মাবলী; তখন এ জিনিসটিও থাকবে না। অনেক প্রতিবাদ ও অভিযোগের সঙ্গে লড়াই করে এতদিন একে বাঁচিয়ে রেখেছি—কিন্তু যারা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তারা একে বিশ্বাস করে না। এর পরে ইস্কুল-মাস্টারের ঝাঁক নিয়ে তারা অতি বিশুদ্ধ জ্যামিতিক নিয়মে চাক বাঁধবে—শান্তিনিকেতনের আকাশ ও প্রান্তর ও শালবীথিকা বিমর্ষ হয়ে তাই দেখবে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। তখন তাদের নালিশ কি কোনো কবির কাছে পৌঁছবে।

৯

আমার মনটা স্বভাবতই নদীর ধারার মতো, চলে আর বলে একসঙ্গেই—বোবার মতো অবাক হয়ে বইতে পারে না। এটা যে ভালো অভ্যাস তা নয়। কারণ মুছে ফেলবার কথাকে লিখে ফেললে তাকে খানিকটা স্থায়িত্ব দেওয়া হয়—যার বাঁচবার দাবি নেই সেও বাঁচবার জন্যে লড়তে থাকে। ডাক্তারি শাস্ত্রের উন্নতির কল্যাণে অনেক মানুষ খামকা বেঁচে থাকে প্রকৃতি যাকে বাঁচবার পরোয়ানা দিয়ে পাঠান নি—তারা জীবলোকের অন্নধ্বংস করে। আমাদের মনে যখন যা উপস্থিত হয় তার পাসপোর্ট বিচার না করেই তাকে যদি লেখনরাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় তাহলে সে গোলমাল ঘটাতে পারে। যে কথাটা ক্ষণজীবী তাকেও অনেকখানি আয়ু দেবার শক্তি সাহিত্যিকের কলমে আছে, সেটাতে বেশি ক্ষতি হয় না সাহিত্যে। কিন্তু লোকব্যবহারে হয় বই কি। চিন্তাকে আমি তাড়াতাড়ি রূপ দিয়ে ফেলি—সব সময়েই যে সেটা অযথা হয় তা নয়—কিন্তু জীবনযাত্রায় পদে পদে এই রকম রূপকারের কাজের চেয়ে চুপকারের কাজ অনেক ভালো। আমি প্রগল্‌ভ, কিন্তু যারা চুপ করতে জানে তাদের শ্রদ্ধা করি। যে-মনটা কথায় কথায় চেঁচিয়ে কথা কয় তাকে আমি এখানকার নির্মল আকাশের নিচে

গাছতলায় ব'সে চুপ করাতে চেষ্টা করছি। এই চুপের মধ্যে শান্তি পাওয়া যায়, সত্যও পাওয়া যায়। প্রত্যেক নূতন অবস্থার সঙ্গে জীবনকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নানা জায়গায় ঘা লাগে—তখনকার মতো সেগুলো প্রচণ্ড, নতুন চলতে গিয়ে শিশুদের পড়ে যাওয়ার মতো, তা নিয়ে আহা উহু করতে গেলেই ছেলেদের কাঁদিয়ে তোলা হয়। বুদ্ধি যার আছে সে এমন জায়গায় চুপ করে যায়—কেননা সব কিছুকেই মনে রাখা মনের শ্রেষ্ঠ শক্তি নয়, ভোলবার জিনিসকে ভুলতে দেওয়াতেও তার শক্তির পরিচয়। ইতি ২৭ পৌষ, ১৩৩৩।

১০

আমি যে তোমাকে চিঠি লিখেছি এতদিন পরে তার একখানি প্রাপ্তিস্বীকার পাওয়া গেল। ইতি পূর্বে গতসপ্তাহে প্রশান্তর একখানি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তাতে বর্তমান য়ুরোপের সর্বত্রই যে—একটা দুশ্চিন্তার আলোড়ন চলছে তার একটা বেশ স্পষ্ট ছবি দেওয়া হয়েছে। মনে করছি এর ইংরেজি অংশ বাংলা ক'রে এটাকে কোনো একটা কাগজে ছাপানো যাবে।

এই মাত্র বিকেলের গাড়িতে রেখা চোখের জল মুছতে মুছতে ঢাকায় তার শ্বশুরবাড়ি অভিমুখে চলে গেল। অমিয় বললে, নতুন বিয়ের কালে যে-কোনো স্বামীকেই তার যে-কোনো স্ত্রীর উপযুক্ত ব'লে মনে হয় না। শুনে মনে হোলো, তার কারণটা এই যে, নববধূ আপনার সব কিছুকেই দান করে, তার চোখের জলের মধ্যে সেই কথাটাই প্রচ্ছন্ন থাকে। অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ বন্ধনের তন্তুতে তন্তুতে বদ্ধ জীবনকে ছিন্ন করে নিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে। কিন্তু তার স্বামী সব দিতে বাধ্য হয় না। এই আদান প্রদানের অসমানতাকে নিজের পৌরুষ সম্পদ দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারে এমন সামর্থ্য অল্পলোকেরই আছে। তার পরে দিন যায়, স্ত্রী ক্রমে যখন নিজের গুণে ও শক্তিতে নিজের সংসার সৃষ্টি ক'রে তোলে

তখন সেইটেই তার পুরস্কার হয়। কেননা তার বাপমায়ের যে-সংসারে সে ছিল সে সংসারে সে ছিল অকর্তা—সে সংসারে তার অধিকার আংশিক ; তার দাম্পত্যের জগৎ তার আপনারি জগৎ। এই জন্যে তার চোখের জল শুকোতে দেরি হয় না। যে-অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অনেক অংশে বিচ্ছিন্ন হয়েছে,বর্তমানের তুলনায় সে অতীতের গৌরব কমে যায়, এইজন্যে তার আকর্ষণ শক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসে। তখন, যা সে দিয়ে এসেছে তার পরিবর্তে যা সে পায় তা বেশি বই কম হয় না।

আমার চিঠি লেখার বয়স চলে গেছে। কলমের ভিতর দিয়ে কথা কইতে গেলে কথার প্রাণগত অনেকটা অংশ ফসকে যায়। যখন মনের শক্তি প্রচুর থাকে তখন বাদসাদ দিয়েও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে। তাই তখন লেখার বকুনিতে অভাবের লক্ষণ দেখা যায় না। এখন বাণী সহজে বকুনিতে উছলে উঠতে বাধা পায়—তাই কলমের ডগায় কথার ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে, বোধ হয় এইজন্যেই লেখবার দুঃখ স্বীকার করতে মন রাজি হয় না।

তা হোকগে, তবু তোমাকে একটা ভিতরকার কথা বলি। সময় অনুকূল নয়, নানা চিন্তা, নানা অভাব, নানা আঘাত, সংঘাত। ক্ষণে ক্ষণে অবসাদের ছায়া ঘনিয়ে আসে, একটা পীড়ার হাওয়া মনের একদিক থেকে আর একদিকে হুহু ক'রে বইতে থাকে। এমন সময় চমকে উঠে মনে পড়ে যায় যে এ ছায়াটা "আমি" ব'লে একটা রাহুর। সে রাহুটা সত্য

র্থ নয়। তখন মনটা ধড়ফড় করে চেঁচিয়ে উঠে' ব'লে ওঠে—ও নেই ও নেই। দেখতে দেখতে মন পরিষ্কার হয়ে যায়। বাড়ির সামনে কাঁকর-বিছানো লাল রাস্তায় বেড়াই আর মনের মধ্যে এই ছায়াআলোর দ্বন্দ্ব চলে। বাইরে থেকে যারা দেখে তারা কে জানবে ভিতরে একটা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। এ সৃষ্টির কি আমারই মনের মধ্যে আরম্ভ আমারই মনের মধ্যে অবসান। বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে এর কি কোনো চিরন্তন যোগসূত্র নেই। নিশ্চয়ই আছে। জগৎ জুড়ে অসীম কাল ধরে একটা কী হয়ে উঠছে আমাদের চিত্তের মধ্যে বেদনায় বেদনায় তারি একটা ধাক্কা চলছে। সভ্যতার ইতিহাস ধারায় মানুষ আজ যে অবস্থার মধ্যে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে, এই অবস্থাসৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে কত কোটি কোটি নামহীন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের চিরবিস্মৃত চিত্ত-সংঘাত আছে। সৃষ্টির যা-কিছু রয়ে যাওয়া তা সংখ্যাহীন চলে যাওয়ার প্রতিমুহূর্তের হাতের গড়া। আজ আমার এই জীবনের মধ্যে সৃষ্টির সেই দূতগুলি, সেই চলে-যাওয়ার দল তার কাজ করছে—"আমি" ব'লে পদার্থটা উপলক্ষ্য মাত্র—বাড়ি তৈরির যে ভারা বাঁধা হয় আজকের দিনে এর প্রয়োজনীয়তার প্রাধান্য যতই থাক্ কালকের দিনে যখন এর চিহ্নমাত্র থাকবে না তখন কারো গায় একটুও বাজবে না। ইমারত আপন ভারার জন্যে কোথাও শোক করে না। মোদ্দা কথাটা এই-যে, আজ আমার এ আমিটাকে নিয়ে যে-গড়াপেটা চলছে এই লাল কাঁকর বিছানো রাস্তা

দিয়ে চলতে চলতে ভিতরে ভিতরে যা-কিছু উপলব্ধি করছি তার অনেকখানিই আমার নামের স্বাক্ষর মুছে ফেলে দিয়ে মানুষের সৃষ্টি ভাণ্ডারে জমা হচ্ছে। ইতি ২৫ মাঘ, ১৩৩৩।

১১

মার্চমাসের শেষেই তোমরা দেশে এসে পৌঁছবে এই ভরসা দিয়েছিলে তাই ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত আমার চিঠির চরকায় সুতো কাটবার মেয়াদ ছিল। এমন সময় হঠাৎ শুনি তোমাদের আসা ঘটবে না, আর আমার চরকার মেয়াদও বেড়ে চলল। গত সপ্তাহে তোমার সেই পরিচিত ফাউন্টেন পেনটিকে বিশ্রাম করতে দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমার শনিগ্রহ একদিন রাত্রি দুটোর সময় আমাকে তলব করলেন। তখন বিছানায় শুয়েছিলুম। হঠাৎ একটা তীব্র শীতের হাওয়া হূ হূ ক'রে এসে আমাকে চঞ্চল ক'রে তুললে। শিওরের কাছের দরজাটা প্রবল বেগে বন্ধ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে দরজাটা আমার ডান হাতের মধ্যমাঙ্গুলির উপর প'ড়ে তাকে পেষণ ক'রে ফেললে। ঐ মধ্যমাঙ্গুলিটিই শিশু-কাল থেকে হেঁট হয়ে আমার লেখনীর ভার বহন ক'রে এসেছে। আমার সাহিত্যইন্দ্রের দুটি বাহন, একটি হচ্ছে বুড়ো আঙুল, সে হোলো ঐরাবত, আরেকটি ঐ মধ্যমিকা তাকে বলা যায় উচ্চৈঃশ্রবা। সে খুবই জখম হয়েছে। তাতে মিস্‌পট্ কাজ পাবার সুবিধে পেল। শুশ্রূষা পুরো জোরে চলেছে। ব্যাণ্ডেজের আবরণে আঙুলটা ইজিপ্ট দেশীয় 'মমির' আকার ধারণ করেছে। নখটা তার কর্মে ইস্তফা

দিয়েও তবু নড়নড়ে অবস্থায় লেগে রইল। সে সম্পূর্ণ পদ-ত্যাগ করলে আমি নিষ্কৃতি পাই। যাই হোক রচনার কাজটা এখন দুঃখসাধ্য। লেখার বিষয়টা যাই হোক তার লাইনে লাইনে আমার এই খোঁড়া আঙুলটা করুণ রস সঞ্চার করছে। কথাটা জানিয়ে রাখলুম—কারণ চিঠির দৈর্ঘ্য প্রস্থের পরিমাণ পরিমাপ ক'রে যখন দেনা পাওনার তুলনামূলক সমালোচনা করবে তখন এই ব্যথার আয়তনটাকে আমার দিকে যোগ ক'রে দিতে হবে। এবারে দায়ে পড়ে চিঠি সংক্ষেপ করতেই হবে। কেবল একটা কথা সংক্ষেপে ব'লে নিই।

যখন কারো সম্বন্ধে আমার মনে ব্যক্তিগত ক্ষোভ জন্মে তখন তার তীব্রতাটা ভিতরে ভিতরে আমার পক্ষে লজ্জার কারণ হয়ে ওঠে। এই আত্মপীড়ন থেকে অনেক জিনিস কুৎসিত হয়ে দেখা দেয়। তার কুৎসাটাকে ভিতরে যখন টেনে নিই তখন আমার মন বলতে থাকে হার হোলো। বাইরের 'পরে বিরক্ত হয়ে নিজের ভিতরকার সামঞ্জস্যকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করলে তাতে নিজের ভারি লোকসান। এ কথা অনেক সময়ই মনে থাকে না, কিন্তু মনের আন্দোলন কোনো কারণে একটু বেশিদিন স্থায়ী হোলেই তখন লোকসানের চেহারাটা স্পষ্টই বুঝতে পারি। কোনো কারণেই নিজেকে ছোটো করবার মতো এমন বোকামি আর নেই।

ভালো ক'রে আত্মবিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস আমার নজরে পড়ে, সে হচ্ছে আমার কর্তব্যবুদ্ধিটা আসলে সৌন্দর্য-বোধ। যখন বাইরের সঙ্গে মন কলহ করতে উদ্যত হয়—

তখন সেই ইতরতায় আমি নিজেকে অসুন্দর দেখি। তাতেই কষ্ট পাই। আত্মমর্যাদার একটি শোভা আছে প্রবৃত্তির বশে আত্মবিস্মৃত হয়ে সেইটেকে যখন ক্ষুণ্ণ করি তখন অনতিকাল পরে মনে ধিক্কার জন্মায়। আমার মধ্যে বন্ধনের জোর বেশি ব'লেই আমার মধ্যে মুক্তির আগ্রহ এত বেশি প্রবল। আমার ব্যবহারে এই দুই শক্তির পরস্পর বিরোধের মধ্যে দিয়ে এ পর্যন্ত সংসার পথে যাত্রা ক'রে এলেম। আজ মাঝে মাঝে আমার এই বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে একলা চলতে চলতে ভাবি—সব ভাঙাচোরাকে সেরে নেবার সময় আছে কি।

কথা বলতে গিয়ে কথা বেড়ে যায়—হায় রে, মধ্যমাঙুলি আহত বলদের মতো কলম টেনেই চলেছে—ইতি ২ মার্চ, ১৯২৭।

১২

আমার সেই আঙুল আজো বন্দীশালায়। যারা তাকে এই অবস্থায় রেখেছে—তারা বলছে ঐ হতভাগ্য এখনো আত্মশাসনের অধিকার পাবার যোগ্য হয়নি। তাই বন্ধনবশত তার আত্মপ্রকাশ অবরুদ্ধ। লেখার কাজ একপ্রকার বন্ধই আছে। আমার কলম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঝে মাঝে এক একটা গান লেখে মাত্র।—"মাত্র" বলছি জনসাধারণের দাবির মাত্রার মাপে। কাব্য রচনাতেও তারা মাপের ফিতে লাগায়। কাব্যরাজ্যে দশলাইনের একটা গানেরও আভিজাত্য থাকতে পারে এ তাদের বোঝানো শক্ত। বোম্বাই আমের চেয়ে চালকুমড়োকে যখন তারা বেশি গৌরব দেয়, তখন সন্দেহ প্রকাশ করলে দাঁড়ি পাল্লা এনে হাজির করে। মনে স্থির করেছি "ম্যালেরিয়াবধ" নাম দিয়ে একটা মহাকাব্য লিখব তাতে কুইনীনকে করব প্রধান নায়ক—কেরোসিন তৈলবাণে মশক সৈন্যদল বধ করবার পুনঃপুন সংগ্রাম হবে তার প্রধান বর্ণনার বিষয়—সাতটা সর্গের ভিতর দিয়ে প্লীহা যকৃতের বিকৃতি মোচন ব্যাখ্যা ক'রে ক্ষুদ্রকায়া কাব্যরচনার দুর্নাম দূর করবার ইচ্ছে রইল।

সম্প্রতি আমার শরীরটা খিটমিট করছে। দু-চার দিন থেকে একটু একটু জ্বরের আভাসও দেখা দেয়। মনটা ক্লান্ত।

..মার চৈতন্যের অগোচরে বোধ হচ্ছে কোনো একটা কালো দুশ্চিন্তা তার ডিমে তা দিচ্ছে। এই ডিমগুলো ভেদ ক'রেই বোধ হয় একটু ক্লান্তি, একটু জ্বর ক্ষণে ক্ষণে বের হয়ে পড়ে। শীতের দস্যু হাওয়ায় কেবলি চারিদিকের গাছ-পালা রিক্ত ক'রে হি হি ধরিয়ে দিয়েছে। আকাশ তারি দৌরাত্ম্যে আচ্ছন্ন, মন একটুও আরাম পায় না। মনে মনে ধ্যান করবার চেষ্টা করি এ সমস্তই বাইরের জিনিস—ইচ্ছা করি, আমার অন্তরলোকের সামঞ্জস্য এরা যেন নষ্ট না করে। জীবনের যে-জিনিস এঁকে শেষ করতে হবে তার পট তো এই এতটুকু—এর মধ্যে নানা বাজে আঁচড় কাটতে দিলে জীবন রচনার দশা কী হবে।

১৩

ভ্রমণ শেষ করে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি। আজ নববর্ষের দিন। মন্দিরের কাজ শেষ করে এলুম। বাইরের কেউ ছিল না কেবল আমাদের আশ্রমের সবাই।

এবার আমার জীবনে নূতন পর্যায় আরম্ভ হোলো। এ'কে বলা যেতে পারে শেষ অধ্যায়। এই পরিশিষ্টভাগে সমস্ত জীবনের তাৎপর্যকে যদি সংহত করে সুস্পষ্ট করে না তুলতে পারি তাহলে অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়ে বিদায় নিতে হবে। আমার বীণায় অনেক বেশি তার—সব তারে নিখুঁত সুর মেলানো বড়ো কঠিন। আমার জীবনে সব চেয়ে কঠিন সমস্যা আমার কবিপ্রকৃতি। হৃদয়ের সব অনুভূতির দাবিই আমাকে মানতে হোলো—কোনোটাকে ক্ষীণ করলে আমার এই হাজার সুরের গানের আসর সম্পূর্ণ জমে না। অথচ নানা অনুভূতিকে নিয়ে যাদের ব্যবহার, জীবনের পথে সোজা রথ হাঁকিয়ে চলা তাদের পক্ষে একটুও সহজ নয়—এ যেন এক্কাগাড়িতে দশটা বাহন জুতে চালানো। তার সবগুলোই যদি ঘোড়া হোত তাহলেও একরকম করে সারথ্য করা যেতে পারত। মুশকিল এই, এর কোনোটা উট, কোনোটা হাতি, কোনোটা ঘোড়া, আবার কোনোটা ধোবার বাড়ির গাধা, ময়লা কাপড়ের বাহক। এদের সকলকে একরাশে বাগিয়ে

এক চালে চালাতে পারে এমন মল্ল ক'জন আছে। কিন্তু আমি যদি নিছক কবি হতুম তাহলে এজন্যে মনে ভাবনাও থাকত না, এমন কি যখন ঘাড়ভাঙা গর্তর অভিমুখে বাহন-গুলো চার পা তুলে ছুটত তখনো অট্টহাস্য করতে পারতুম,—এমন-সকল মরীয়া কবি সংসারে মাঝে মাঝে দেখা যায় তারা স্পর্ধার সঙ্গে বলতে পারে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমার স্বধর্ম কী তা নিয়ে বিতর্ক আর ঘুচল না। এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি কবিধর্ম আমার একমাত্র ধর্ম নয়—রস বোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়। অস্তিত্বের নানা বিভাগেই আমার জবাবদিহি—সব হিসাবকে একটা চরম অঙ্কে মেলাব কী করে। যদি না মেলাতে পারি তাহলে সমস্যা অত্যন্ত কঠিন ব'লে তো পরীক্ষক আমাকে পার করে দেবেন না—জীবনের পরীক্ষায় তো হাল আমলের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য পাওয়া যায় না। আমার আপনার মধ্যে এই নানা বিরুদ্ধতার বিষম দৌরাত্ম্য আছে ব'লেই আমার ভিতরে মুক্তির জন্যে এমন নিরন্তর এবং এমন প্রবল কান্না। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩৩৪।

১৪

আমাকে পোর্টসায়েদে চিঠি দিতে লিখেছ। গেল সপ্তাহে পাঠিয়েছি। দেনা পাওনার কোনো প্রত্যাশা না করেই এতদিন আমার চিঠিতে আমি নিজের মনের ঝোঁকে বকে গিয়েছি। বকবার সুযোগ পেলেই আমি বকি, এবং বকতে পারলেই আমি নিজের মনকে চিনি, তার বোঝা লাঘব করি—সাহিত্যিক মানুষের এইটেই হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু বকতে পারা একান্ত আমার নিজের গুণ তা নয়—শ্রোতার পক্ষে বকুনি আদায় করে নেবার শক্তি থাকা চাই। ইচ্ছে করলেও মন মনের কথা দিতে পারে না। আমাদের এখানে প্রতিদিনই এই বৈশাখের আকাশে জলভরা মেঘ আনাগোনা করছে,প্রতিদিন ফিরে ফিরে যাচ্ছে, এক ফোঁটা জল দিতে পারছে না। যে বায়ুমণ্ডল জল নেবে, তার জোর পোঁচচ্ছে না। মোট কথা হচ্ছে, আমার কথাভরা মনের পক্ষে বকুনিটা আমার নিজেরই গরজে। কিন্তু তাই ব'লে পোস্টআফিস ব'লে একটা বস্তাবাহক স্থূল পদার্থকে মনের সামনে খাড়া করে কথা বলতে চাইলেই যে নিরবধি বলে যেতে পারি এত বড়ো পৌত্তলিক আমি নই। সেইজন্যে যখন মনে ধোঁকা আসে যে পোস্টআফিসের চরম প্রান্তে কর্ণবান কেউ নেই, আছে আমেরিকান একস্‌প্রেসের

আপিস, তখন কথার ধারা বন্ধ হয়ে যায়। তোমাদের চিঠি মনের কথার চিঠি নয়, খবর দেওয়ার চিঠি,—সেই খবরগুলি কোথায় গিয়ে পৌঁছয় তাতে তেমন বেশি কিছু আসে যায় না। কিন্তু কথাটা ভালো হোলো না। তুমি ভাববে তোমাকে খোটা করলেম। ইচ্ছে ক'রে খোঁটা দেবার জন্যে করিনি—হয়তো অবচেতন চিত্ত থেকে করে থাকতে পারি। একথা বলতেই হবে মনের কথা বলাই আমার প্রকৃতি ;—বলতে পারি ব'লেই বলি, না বলতে পারলে খবর লিখতুম। তাতে দোষ নেই, পড়তে ভালোই লাগে—এমন কি, চিঠিতে খবর লিখতে না পারার অক্ষমতা নিয়ে আমি নিজেকে নিন্দাও করি। ইতি ৮ই বৈশাখ, ১৩৩৪।

১৫

আজ সকালে বিচ্ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে চমৎকার সূর্যোদয় হয়েছিল, ঈষৎ বাষ্পাবিষ্ট তার সকরুণ আলো এখানকার গাছপালা বাড়িঘর সব কিছুকে স্পর্শ করেছিল। এই তো চির পরিপূর্ণতার সুর—এইতো বিশ্বকে চিরনবীন করে রেখেছে—যত বড়ো আঘাত যত নিবিড় কালিমাই জগতের গায়ে আঁচড় কাটতে থাকে তার কোনো চিহ্নই থাকে না—পরিপূর্ণের শান্তি সমস্ত ক্ষয়কে অনিষ্টকে নিয়তই পূরণ ক'রে বিরাজ করে। ঐ প্রতিদিন প্রভাতের কাঁচাসোনাকে কিছুতেই একটুও ম্লান করতে পারেনি, আর আমার দ্বারের কাছে নীলমণিলতা যে উচ্ছ্বসিত বাণী আকাশে প্রচার করছে আজ পর্যন্ত সে একটুও ক্লান্ত হোতে জানল না। আমি ঐখান থেকে আমার জীবনের মন্ত্র নিতে চাই, কোনো গুরুভার গুরুবাক্য থেকে নয়—গাছ যেমন করে পাতা মেলে দিয়ে আকাশের আলো থেকে অদৃশ্য অচিহ্নিত পথে ডেকে নেয় আপনার প্রাণ আপনার তেজ। ইতি ৩০ কার্তিক, ১৩৩৪।

১৬

ঠিক সময়েই বর্ধমানে গাড়ি পৌঁছল। স্টেশনে নেমে সময় কাটাবার উপলক্ষ্যে খাবার ঘরে ঢুকে টানাপাখার নিচে বসলুম—এক পেয়ালা কফি হুকুম করতে হোলো—বলা বাহুল্য সেটা অনাবশ্যক ছিল। যখন এল কফি, তখন দেখা গেল সেটা পান করা অনাবশ্যকের চেয়েও মন্দ। দ্বিতীয় গাড়ি আসতে পাঁচ মিনিট বাকি—আরিয়াম এসে বললে আজকের দিনেই বিশেষ কারণে গাড়ি অন্য প্ল্যাটফর্মে ভিড়বে—সাঁকো পার হয়ে যেতে হবে। আমাকে একটা ঝুলিবাহনে কুলি-বাহন যোগে লাইন পার করবার ব্যবস্থা করেছিল—আমি এরকম অপ্রচলিত যানাধিষ্ঠিত হয়ে সাধারণের গোচর হোতে আপত্তি করলুম। তারপরে সর্বসাধারণের নির্দিষ্ট পথে চলতে গিয়ে দেখলুম, প্রকৃতি সে পথের পাথেয় আমার অনেক কমিয়ে দিয়েছেন—বুঝলুম প্রকৃতি আমাকে অনাবশ্যক বোধে সাধারণের পথ থেকে হাফ পেন্‌সনে সরিয়ে রেখেছে, বছরে বছরে যখন তার বাজেট স্থির হবে আমার পেন্সন থেকে আরো বাদ পড়বে। পুরোনো সেবকের প্রতি প্রকৃতির দয়ামায়া নেই। এক মুহূর্তে কোনো কারণ না দেখিয়ে তাকে বরখাস্ত করতে তার একটুও বাধে না। কিন্তু আমি যে কর্মক্ষেত্র থেকে বরখাস্তের যোগ্য একথা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাই।

বোলপুর স্টেশনে এসে পৌঁছলুম। কী ঘনঘোর মেঘ—বৃষ্টিতে সমস্ত মাঠ ভেসে গেছে—চারদিকে সবুজ। এত বড়ো আকাশ এবং অবারিত মাঠ না থাকলে বর্ষার মেজাজটা ছিঁচকাঁদুনে গোছের হয়ে ওঠে, তার মর্যাদা নষ্ট হয়। যাই হোক এতদিনে এখানে এসে পুরো বছরের বর্ষা পাওয়া গেল—তার মধ্যে ছাঁট কাট নেই।

আডিয়ার আশ্রমে মশার সংখ্যা এবং হিংস্রতা দেখে দেহ মন অভিভূত হয়েছিল—শান্তিনিকেতন আশ্রম তার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। এদের সঙ্গে যুদ্ধের একমাত্র উপায় বাষ্পবাণ—সন্ধ্যা থেকে সমস্ত রাত্রি কার্টোল-ধূম প্রয়োগ করেছি—এই রূঢ় আচরণে কিছু তারা দুঃখিত হোলো দেখলুম, এমন কি একদল walk out করলে কিন্তু যে কয়টি die-hards টিকে রইল শান্তিভঙ্গের পক্ষে তারা যথেষ্ট। ভোরে উঠে প্রতিদিন একটুখানি বসি—কিন্তু তারা আমার চেয়েও ভোরে ওঠে। এদিকে মুষলধারায় বৃষ্টি, দক্ষিণ ও পুব দিক থেকে বেগে হাওয়া দিচ্ছে, দরজা বন্ধ করে সকাল কাটল—আলো জ্বাললুম, তাতে মশাগুলো উৎসাহিত হয়ে মনে করলে তাদের ভোজে নিমন্ত্রণ করেছি—কিছুতেই চরণ-প্রান্ত ছাড়তে চায় না। ইতি ২০ আষাঢ়, ১৩৩৫।

১৭

বৃষ্টি ধরে গেছে, মেঘও গেছে সরে—চারিদিকে সরস সবুজের চিকন আভা—একেবারে ঝল্‌মল্‌ করছে—বাঙ্গালোরের সেই সবুজ সিল্কের সাড়িতে যেন সোনালি সুতোর কাজ করা। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। এখন বেলা তুটো। কেয়াফুলের গন্ধ আসছে—টেবিলের একপাশে কে রেখে দিয়েছে। এই বর্ষাদিনের তুপুরবেলাকার রোদ্দুর ঈষৎ আর্দ্র, তার উপরে যেন তন্দ্রার আবেশ; সামনের আকন্দগাছে ফুল ধরেছে, গোটাকতক প্রজাপতি কেবলি ফুরফুর করে বেড়াচ্ছে।—কোথাও কোনো শব্দটিমাত্র নেই,—চাকরবাকর আহারে বিশ্রামে রত, ছুতোর মিস্ত্রির দল এখনো কাজ করতে আসেনি। বসে বসে কোনো একটা খেয়ালের কাজ করতে ইচ্ছে করছে—এই "রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়"—গুন্‌ গুন্‌ করে গান করতে কিংবা সৃষ্টিছাড়া ধরণের ছবি আঁকতে—অথচ তুটোর কোনোটাই করা হবে না, সহজ ইচ্ছেগুলোরই সহজে পূরণ হয় না। আমার ক্লান্তিভরা কুঁড়েমির ডিগ্রিটা অতটুকু কাজ করারও নিচে। সেই "মিতা" গল্পটায় মাজাঘষা করছিলুম—অল্প কিছু বেড়েও গেছে। এখানকার শ্রোতাদের ভালোই লাগল। আবার একটা নূতন গল্পে প্রথম ধাক্কা দেবার মতো জোর পাচ্ছিনে।

যে গল্পের মানুষগুলো প্রচ্ছন্ন আছে, সে গল্পের বোঝা ভারি, তার কারণ একলাই তাকে ঠেলতে হয়—যখন তারা প্রস্তুত হয়ে বেরোয় তখন তারা অনেকটা পরিমাণ নিজেরাই ঠেলা লাগায়। ইতি ৮ জুলাই, ১৯২৮

১৮

কলকাতায় যাই যাই করি, কিন্তু পা ওঠে না। তার কারণ এ নয় যে এখানকার শ্রাবণের টানে আট্‌কা পড়েছি। কারণটা কিছু সূক্ষ্ম—সাইকোলজিকাল।

আজ চল্লিশবছর হয়ে গেল আমার মনের মধ্যে একটা সংকল্পের সম্পূর্ণ ধ্যানমূর্তি জেগে উঠেছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে Vision। তখন বয়স ছিল অল্প, মনের দৃষ্টিশক্তিতে একটুও চাল্‌শে পড়েনি। জীবনের লক্ষ্যকে বড়ো করে সমগ্র করে স্পষ্ট করে দেখতে পাবার আনন্দ যে কতখানি তা ঠিক-মতো তোমরা বুঝতে পারবে কিনা জানিনে। সে আনন্দের পরিমাণ পাবে আমার ত্যাগের পরিমাপে। আমার শিলাইদা, আমার সাহিত্যসাধনা, আমার সংসার সমস্তকেই বঞ্চিত করে আমি বেরিয়ে এসেছিলুম। আমার ঋণের বোঝা ছিল প্রকাণ্ড, কাজের অভিজ্ঞতা ছিল নাস্তি। তারপরে সুদীর্ঘ-কাল এই দুস্তর অধ্যবসায়ে একলা পাড়ি দিয়েছিলুম। কাউকে দোষ দিইনি, কারো উপর দায় চাপাইনি, কারো কাছে ভিক্ষে চাইনি। তারি মাঝখানে সংসারের নানান দুঃখ গেল। কিন্তু সেই সময়টাতেই মনের ভিতর মহলে যেন সব আলোই জ্বলে উঠেছিল। সেটা বুঝতে পারবে যদি ভেবে দেখো তখনকার বঙ্গদর্শনে কী লিখছি—তখনকার পার্টিশন

আন্দোলনে কী দোলা লাগিয়েছি,—মনের মধ্যে ভারতবর্ষের একটা নিত্যরূপ দেখা দিচ্ছে অথচ তার সঙ্গে মানুষের বিশ্ব-রূপের বিরোধ নেই,—পল্লীতে পল্লীতে নিজের চেষ্টায় স্বাতন্ত্র্যের কেন্দ্র স্থাপনের কল্পনা মনের মধ্যে খেপে বেড়াচ্ছে,—শিলাইদহে নিজেদের জমিদারির মধ্যে তার চেষ্টাও চলছে। আমার এই নানামুখী চেষ্টার মাঝখানে গভীর একটা তপস্যা ছিল—একেবারে ছিলুম সন্ন্যাসী, সত্যের অন্বেষণে এবং সত্যকে রূপ দেবার একান্ত সাধনায়। তখন বিপদ ছিল চারিদিকে এবং দারিদ্র্য ছিল ঘরের মধ্যে। সেদিনকার ঢেউ থামল কিন্তু আমার অন্তরের মধ্যে নিয়ত কর্ম চলছেই। মনকে টানছে মানুষের দিকে—বাইরের বড়ো রাস্তায়। ডাকঘর লিখেছিলুম সেই কথাটা বলতে। দইওয়ালার হাঁক বলো আর প্রহরীর ঘণ্টা বলো কিছুই তুচ্ছ নয়—তারা বিরাট বাহিরের বাণীতেই প্রকাশ পাচ্ছে—সেই বাহির আমাকে সেদিন বলছিল আমার মধ্যে তোমার স্থান। সেই সময়েই রোজ সকালে বিকেলে রাত্তিরে লিখছি গীতাঞ্জলির গান—শারদোৎসবে ছেলেদের সঙ্গে উৎসব জমিয়েছি, এখানকার শাল-বীথিকায় জ্যোৎস্না নিশীথে পরিপূর্ণ মন নিয়ে একলা একলা ঘুরেছি। সেদিন ছেলেরা নিশ্চয়ই আমার প্রাণোচ্ছ্বাসের অংশ পাচ্ছিল, অন্তত আমি তাদের কৈশোরের রসে অভিষিক্ত ছিলুম।

এখন শরীর ক্লিষ্ট ক্লান্ত, মনের অনেকগুলো আলো নিভে গেছে—আমার সেদিনকার পরিচয়টাকে এখানকার

প্রদোষান্ধকারে ভালো করে আর খুঁজে পাইনে। আমার সেদিনকার ধ্যানরূপের প্রতিবিম্ব আমার চারিদিকে কারো মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় না। বুঝতে পারি কাছের লোকের মধ্যে আমার প্রাণের অনুপ্রাণন ঠিকমতো ঘটে ওঠেনি। ✓আমার পিতৃদেব যেমন করে আপনার জীবনের দীক্ষাকে রেখে গেছেন আমি আমার অন্তরের ধ্যানটিকে তেমন করে রেখে যেতে পারব না। তার জায়গায় ব্যবস্থা আসবে, কর্মের চাকা চলবে। একটা কারণ, আমার মনঃপ্রকৃতির বিচিত্রতা, আমি সব দিকেই যাই, সব কথাই বলি, সব ছবিই আঁকি। ✓

অথচ ক্ষণে ক্ষণে যখন দেখি বিদেশের লোক এ জায়গা-টার ভাবের ছবি দেখে গেছে, তাদের অনেক লেখাতেই সেটা পড়লুম—তখন মনের ভিতরে একটা কান্না আসে এই ছবিটিকে মুছতে দিয়ো না, এর দাম আছে, তোমার যা কিছু বড়ো, যা কিছু সজীব এখনো এর মধ্যে উৎসর্গ করো।

সেই যে সেদিন আমার জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে একটি উজ্জ্বল ধ্যান, নীহারিকার মাঝখানে নক্ষত্রের মতো, অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল তাকে আবার দেখতে পাই এখানে যখন একলা বসে থাকি, চারিদিকে আর কোনো কথা থাকে না কেবল থাকে আমার সেই অতীতকালের বাণী। তাকে হারাতে ভুলতে ঝাপসা হোতে দিতে ইচ্ছে করে না। জীবনের সত্যযুগ মাঝে মাঝে আসে, তখন নিজেকে সত্য করে পাই, তখনকার চিন্তা এবং কর্ম একটা ধ্যানকেন্দ্রকে ভাবকেন্দ্রকে আশ্রয়

ক'রে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। সেই সত্যযুগের সঙ্গে সঙ্গে আসে কর্মযুগ—কর্মযুগে নানা মানুষ নানা কথা তুচ্ছতা মনের আকাশকে কেবল যে আবিল করে তা নয় উদ্যমকে ক্ষুণ্ণ করতে থাকে। আমাদের দেশের মন আধিভৌতিক, materialistic। সেই মনের ধ্যান সম্পদ নেই—আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে বড়ো খর্ব, বড়ো সংকীর্ণ, বড়ো কঠিন করে দেয়। যাদের ধ্যানরূপের দৃষ্টি নেই তাদের কাছে ধ্যানরূপের মূল্য নেই। চারিদিকের এই ঔদাসীন্য থেকে এই স্থূলহস্তাবলেপ থেকে নিজের মনে উৎসাহের নবীনতাকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়। বিশেষত শরীর যখন দুর্বল।

এইজন্যেই এখান থেকে নড়তে এত অনিচ্ছা হয়। সেদিনকার বিশুদ্ধ আনন্দের স্পর্শ চুপচাপ বসে এখনো পাই—আজ বুধবার ভোরে আমার সেইদিনকার আমি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল। আমার দৌর্বল্যের উপলক্ষ নিয়ে এ'কে আবার একপাশে সরিয়ে ফেলতে একটুও ইচ্ছে করে না। কেননা জীবনের সত্যকে যতই ম্লান করি ততই অবসাদে নৈরাশ্যে পেয়ে বসে। সত্য যখন সজাগ থাকে তখন কর্মের ফলাফল যাই হোক না কেন পরিতৃপ্তির অভাব ঘটে না। ইতি ৯ শ্রাবণ, ১৩৩৫।

১৯

দীর্ঘকাল না করেছি কোনো কাজের মতো কাজ, বা পড়ার মতো পড়া। সেইজন্যেই ভিতরে ভিতরে মনটা আত্ম-অসন্তোষের ভারে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে আছে। শূন্য দিনের মতো বোঝা জীবনে আর কিছুই নেই বিশেষত জীবনের মেয়াদ যখন খাটো হয়ে এসেছে। নিজেকে যতই ছোটো করে আনছি ততই তার ভার বড়ো করে বইতে হচ্ছে। প্রতি-দিনই মনে মনে নিজেকে লাঞ্ছনা করছি—মনে হচ্ছে অন্ধকারে হাৎড়ে হাৎড়ে নিজেকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনে—কোথায় সে কোন্ অকিঞ্চিৎকরতার মধ্যে তলিয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই। অনবধানতায় প্রত্যহ আমি আমার অধিকাংশ জিনিসই হারাই, কাগজ কলম ঘড়ি চষমা খাতা ইত্যাদি—নিজেকেও হঠাৎ হারিয়ে ব'সে আর তার টিকি দেখতে পাইনে। মরার চেয়ে এই হারানো আরো বেশি লোক-সানের। এই হারিয়ে যাওয়া ভূতে পাওয়া অকর্মণ্য দিন-গুলো থেকে এক দৌড়ে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে। যে প্রদীপ সমস্ত রাত পরিষ্কার আলো দিয়েছে ভোরের বেলায় তার তৈল-দীন শিখা নিজের ধোঁয়াতে নিজেকে বন্দী করে কেন। ইতি ১৮ ভাদ্র, ১৩৩৫।

২০

কাল খুব ক্লান্ত হয়েই এসেছিলুম। আজ সকালে শরতের আকাশে আলোতে হাওয়াতে মিলে আমার শুশ্রূষায় লেগে গেছে। অন্য নার্সিংহোমের দোষ হচ্ছে সেটা যে রোগীরই আশ্রয় একথা তার সর্বাঙ্গে ছাপমারা, প্রকৃতির শুশ্রূষাগারে আয়ডোফর্মের গন্ধ নেই—জলে স্থলে আকাশে সবাই বলছে এটা নীরোগী নিকেতন। তাই মনও বলে ওঠে আমার কোনো বালাই নেই। আজ সকালে আমার ভাবখানা এই যে, কাজ করা চাই—কিন্তু কোনো ঝঞ্ঝাট পোহাতে পেরে উঠব না। কোনো কোনো ছেলেকে মাছের কাঁটা বেছে সাবধানে খাওয়াতে হয়, আমার অবস্থাটা সেইরকম—ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়ে আমাকে কাজ করাতে হবে। মাছটা খাওয়াই চাই কিন্তু কাঁটা আর কেউ বেছে দেবে—একেই খাঁটি গ্রাম্য বাংলায় বলে "আহ্লাদ।" কবিত্বটাকে নিয়ে ষোলোআনা মন ভরে না। পাহাড়টা আছে তার উপরে যদি রং বেরঙের মেঘের খেলা থাকে তাহলেই দৃশ্যটা বেশ ভরপুর হয়—শুধু মেঘ নিয়ে দৃশ্য জমে না। আমাকে কাজ করতেই হবে—অথচ ভীরুমনকে হাঙ্গামার ভয় থেকে বাঁচিয়ে চলা চাই। সংসার এত আবদার সইতে পারে না—কিন্তু সংসারের অনেক সেবা অনেক হাঙ্গামা পুইয়ে আমি করেছি—তাই শেষ দশায় এই প্রশ্রয়টুকু দাবি করতেও পারি। ইতি ২৬ ভাদ্র, ১৩৩৫।

২১

আকাশ ঘন মেঘে আজ আচ্ছন্ন, কিছুদিন থেকে বৃষ্টির অভাব ঘটাতে তরুণ ধানের খেত পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে—তারা বিদায়কালীন বর্ষার দানের জন্যে উৎসুক হয়ে আকাশে চেয়ে আছে। মেঘের কৃপণতা নেই কিন্তু বাতাস হয়েছে অন্তরায়। যেই বৃষ্টির আয়োজন প্রায় পূর্ণ হয়ে ওঠে অমনি কুমন্ত্রীর মতো প্রতিকূল হাওয়া কী যে কানে মন্ত্র দেয় উপরিওয়ালার সমস্ত পলিসি যায় বদ্‌লে। আকাশের পার্লামেণ্টে কয়েকদিন ধরে আশা নৈরাশের বিতর্ক চলছে—আজ বোধ হচ্ছে যেন বাজেট পাস হয়ে গেছে—বর্ষণ হোতে বাধা ঘটবে না। খুব ঝমাঝম যদি বৃষ্টি নামে তাহলে চমৎকার লাগবে।—এ বৎসরটা আমার কপালে বাদলের সম্ভোগটা মারা গেছে।—জোড়া-সাঁকোর গলি জলে ভেসে গেছে কিন্তু মনের মধ্যে বর্ষার মৃদঙ্গ নাচের তাল লাগায়নি। এবারকার বর্ষায় গান হোলো না—এমন কার্পণ্য আমার বীণায় অনেকদিন ঘটেনি। ইতি ৩১ ভাদ্র, ১৩৩৫।

২২

মহারানী ভিক্টোরিয়া যখন কোনোমতেই মরবার লক্ষণ দেখাচ্ছিলেন না, তখন তাঁর ছেলের রাজ্যভোগের আশা যেমন অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল এবারকার শরতের সেই দশা। বর্ষা, শেষ পর্যন্ত তার আকাশের সিংহাসন আঁকড়ে রইল,—মাঝে মাঝে দু চার দিন ফাঁক পড়েছে—হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানির দল ক্ষণকালের জন্য যেমন তাদের মাদোল পিটুনিতে ক্ষান্ত দেয়, তার পরেই আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কোলাহল শুরু করে। এমনি করতে করতে শরতের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল—হেমন্ত এসে হাজির। ধরাতলে শিউলি মালতী বর্ষার অভ্যর্থনার আয়োজন যথেষ্ট করেছে, কিন্তু আকাশতলে দেবতা পথ আট্‌কে ছিলেন। শীতের বাতাস শুরু হয়েছে, গায়ে গরম কাপড় চড়িয়েছি। ভালোই লাগছে—বিশেষত বেলা দশটার পর থেকে প্রান্তরের উপর যখন পৃথিবীর রোদ পোহাবার সময় আসে—নির্মল আকাশে একটা ছুটির ঘোষণা হোতে থাকে—পথ দিয়ে পথিকেরা চলে মনে হয় যেন ছবি রচনায় সাহায্য করবার জন্যেই, ত আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি প্রায় প্রত্যেক দি

আমার এই চেয়ে দেখার বিবরণটা লিখি। পৃথিবী কিছুতেই আমার কাছে পুরানো হোলো না—ওর সঙ্গে আমার মোকাবিলা চলছে এইটেই আমার সব খবরের চেয়ে বড়ো খবর। ইতি ১৮ কার্তিক, ১৩৩৫

২৩

রথীরা পথ খোলা পেয়েছে। শুক্রবার সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছবে। তারপরে কবে এখানে আসবে পরে জানতে পাব।

আমার এখনকার সর্বপ্রধান দৈনিক খবর হচ্ছে ছবি আঁকা। রেখার মায়াজাল আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেল। কোনোকালে যে কবিতা লিখতুম সে কথা ভুলে গেছি। এই ব্যাপারটা মনকে এত করে যে আকর্ষণ করছে তার প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে শিবের জটা থেকে গোমুখী বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে তেমনি করে কাব্যের ঝরনা কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হোতে থাকে। আমি যে সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উলটো প্রণালী—রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্‌ট হতুম তা গোড়াতেই সংকল্প করে ছবি আঁকতুম, মনের জিনিস খাড়া হোত—তাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু নিজের

রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে আরো যেন বেশি নেশা। ফল হয়েছে এই যে, বাইরের আর সমস্ত দায়িত্ব দরজার বাইরে এসে উঁকি মেরে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। যদি সেকালের মতো কর্মদায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতুম, তাহলে পদ্মার তীরে বসে কালের সোনার তরীর জন্যে কেবলি ছবির ফসল ফলাতুম। এখন নানা দাবির ভিড় ঠেলে ঠুলে ওর জন্যে অল্পই একটু জায়গা করতে পারি। তাতে মন সন্তুষ্ট হয় না। ও চাচ্ছে আকাশের প্রায় সমস্তটাই, আমারো দিতে আগ্রহ, কিন্তু গ্রহদের চক্রান্তে নানা বাধা এসে জোটে —জগতের হিতসাধন তার মধ্যে সর্বপ্রধান। ইতি ২১ কার্তিক, ১৩৩৫।

২৪

এতদিনে আমাদের মাঠের হাওয়ার মধ্যে শীত এসে পৌঁছল। এখনো তার সব গাঁঠরি খোলা হয়নি। কিন্তু আকাশে তাঁবু পড়েছে। বাতাসে ঘাসগুলো, গাছের পাতাগুলো একটু একটু সির সির করতে আরম্ভ করল। তরুণ শীতের এই আমেজটায় কঠোরে কোমলে মিশোল আছে। সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বসি কিন্তু ঘরের ভিতরকার নিভৃত আলোটি পিছন থেকে মৃদুস্বরে ডাক দিতে থাকে। প্রথমে গায়ের কাপড়টা একটু ভালো করে জড়িয়ে নিই, তার খানিকটা পরে মনটা উঠি উঠি করে, অবশেষে ঘরে ঢুকে কেদারাটায় আরাম করে বসে মনে হয় এটুকুর দরকার ছিল। এখন দুপুর বেলায় মেঘমুক্ত আকাশের রৌদ্দুর সমস্ত মাঠে কেমন যেন তন্দ্রালসভাবে এলিয়ে রয়েছে; সামনে ঐ দুটো বেঁটে পরিপুষ্ট জামগাছ পূর্বউত্তরদিকে ঘাসের উপর এক এক পোঁচ ছায়া টেনে দিয়েছে। আজ ওখানে একটিও গোরু নেই, সমস্ত মাঠ শূন্য, সবুজ রঙের একটা প্রলেপ আছে কিন্তু তার প্রা[illegible] অনেক কম। ঐ আমাদের টগরবীথিকার গাছগুলি রোদ্দ ঝিলিমিলি এবং হাওয়ায় দোলাদুলি করছে। বাতাস [illegible] তেতে উঠল না। নিঃশব্দতার ভিতরে ঐ রাঙা গোরুর গাড়ির একটা আর্তস্বর মাঝে মাঝে শোনা

আর, কী জানি কোন্ সব পাখির অনির্দিষ্ট ক্ষীণ আওয়াজ যেন নীরবতার সাদা খাতায় সরু সরু রেখায় ছেলেমানুষি হিজিবিজি কাটছে। জানি না, কেন আমার মনে পড়ছে বহুকাল আগে সেই যে হাজারিবাগে গিয়েছিলুম; ডাকবাংলার সামনের মাঠে হাতাওয়ালা কেদারায় আমি অর্ধশয়ান, রোদ্দুর পরিণত হয়ে উঠেছে, কাজকর্মের বেলা হোলো— মাঝে মাঝে অনতিদূরে ঘণ্টা বাজে। সেই ঘণ্টার ধ্বনি ভারি উদাস। আজ হাটের দিনে হাট করে পথিকরা রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে চলেছে, কারো বা মাথায় পুঁটুলি, কারো বা কাঁধে বাঁক। আর সেই ঘণ্টার ধ্বনি যেন আকাশে নীরবে বাজছে, মূলতানে বলছে বেলা যায়। ইতি ২৫ কার্তিক, ১৩৩৫।

২৫

রথীরা এসে পৌঁছেছে। বাড়ি ভরে উঠল, পুপু একটুখানি লম্বা হয়েছে; ভাবখানা আগেকার চেয়ে অল্প একটু গম্ভীর, কিন্তু তবু ওর বয়সের চেয়েও অনেকটা কমবয়সী। অসম্ভব রকমের বাঘের সম্বন্ধে ওর ঔৎসুক্য পূর্বের মতোই আছে। দাদামহাশয়ের লাঠি এবং পুপের চাবুকের ভয়ে বাঘ ব্যাকুল হয়ে লুকিয়ে আছে এ সম্বন্ধে ওর সন্দেহ নেই। আজকাল মাঝে মাঝে আপনি দাদামহাশয়ের কাছে এসে বসে, যা মুখে আসে একটা কোনো ভূমিকা করে কথা শুরু করে দেয়। বিষয়টা যতই অসংলগ্ন হোক ওর ভাষার দৌড়ের ব্যাঘাত করে না। ওর বড়ো বড়ো চঞ্চল কালো চোখ ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে জ্বল্-জ্বল্ করতে থাকে, আমার যেন বুকের ভিতরটা ভরে ওঠে। দীর্ঘকাল আমার মন এই মাধুর্যটুকুর অপেক্ষায় ছিল। অথচ জিনিসটি খুব সহজ, হৃদয়ের মধ্যে এই শিশুর আবির্ভাব ভারি নির্মল, স্নিগ্ধ এবং অনির্বচনীয়, মনকে হরণ করে অথচ মুক্ত রাখে; নদীর প্রথম সূচনা যে ঝরনায় সেই ঝরনার মতো সেইরকম নৃত্য, সেইরকম কলধ্বনি, সেইরকম শুভ্র চ আলোর ঝলমলানি; গভীরতা নেই, কিন্তু প্রবলতা ত মগ্ন করে না, অভিষিক্ত করে, মর্ত্যের ভার ওতে যথেষ্ট তাতে করেই ও যেন আমারও জীবনের ভার মোচন ইতি ২৭ কার্তিক, ১৩৩৫।

থেকে কতদূরে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই; তাই এর জন্য ত্যাগ করা সহজ, এর জন্যে কাজ করতে ক্লান্তি নেই। সেই-জন্য আজকাল আমি আমার মধ্যে যেন বহুদূরকে দেখি, আমি এখন আমার কাছে থাকিনে। আমার চোখের সামনে যেমন এই আকাশ, আমার চিন্তার মধ্যে সেই আকাশ, আমার চেষ্টা উড়ে চলেছে সেই আকাশে। এই রকমের কাজে অনেকে জড়িত হয়ে থাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা পাবার জন্যে; এমন উদার কাজও তাদের পক্ষে বন্ধন, মুক্তির ক্ষেত্রেও তারা Interned। আমার কাজে আমি ক্ষমতা চাইনে, আমার নিজের দিকের কিছুই চাইনে, কাজের মধ্যে আমি বিরাট বাহিরকে চাই, দূরকে চাই—"আমি সুদূরের পিয়াসী।" বস্তুত বাহির থেকে দেখলে আজকাল আমার লেশমাত্র সময় নেই, কিন্তু ভিতর থেকে দেখলে প্রত্যেক মুহূর্তই আমার অবকাশ। নিজের দিকে কোনো ফল পাব একথা যখনি ভুলি তখনি দেখতে পাই কর্মের মতো ছুটি আর নেই। কর্মহীন শুধু ছুটিতে মুক্তি পাইনে, কেননা সে ছুটিও নিজেকে নিয়েই।

তি ৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫।

২৭

অন্য কথা পরে হবে, গোড়াতেই বলে রাখি তুমি যে চা পাঠিয়েছিলে সেটা খুব ভালো। এতদিন যে লিখিনি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ববশত। যেমন আমার ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা। একটা যা হয় কিছু মাথায় আসে সেটা লিখে ফেলি, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ছোটো বড়ো যে সব খবর জেগে ওঠে তার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার ছবিও ঐরকম। যা হয় কোনো একটা রূপ মনের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পাই, চারদিকের কোনো কিছুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সংলগ্নতা থাক্ বা না থাক্। আমাদের ভিতরের দিকে সর্বদা একটা ভাঙা-গড়া চলা-ফেরা জোড়াতাড়া চলছেই ; কিছু বা ভাব, কিছু বা ছবি নানারকম চেহারা ধরছে—তারই সঙ্গে আমার কলমের কারবার। এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই—স্পষ্ট বুঝতে পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা। আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ। আশ্চর্য এই যে তাতে গভীর আনন্দ। ভারি নেশা। আজকাল রেখায়

আমাকে পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছিনে। কেবলি তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই। যে বিধাতা ছবি আঁকেন এতদিন পরে তাঁর মনের কথা জানতে পারছি। অসীম অব্যক্ত, রেখায় রেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করছেন—আয়তনে সেই সীমা কিন্তু বৈচিত্র্যে সে অন্তহীন। আর কিছু নয়, সুনির্দিষ্টতাতেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। অমিতা যখন সুমিতাকে পায় তখন সে চরিতার্থ হয়। ছবিতে যে আনন্দ, সে হচ্ছে সুপরিমিতির আনন্দ, রেখার সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে দেখি—মন বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে পেলুম—তা সে যাকেই দেখি না কেন, এক টুকরো পাথর, একটা গাধা, একটা কাঁটা গাছ, একজন বুড়ি, যাই হোক। নিশ্চিত দেখতে পাই যেখানেই, সেখানেই অসীমকে স্পর্শ করি, আনন্দিত হয়ে উঠি। তাই ব'লে একথা ভুললে চলবে না যে তোমার চা খুব ভালো লেগেছে। ইতি ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

২৮

কাল গাড়ি চলতে চলতে তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম। কিন্তু সে এমন একটা নাড়া-খাওয়া চিঠি, ভূমিকম্পে আগাগোড়া ফাটল-ধরা বাড়ির মতো। তার অক্ষরগুলো অশোকস্তম্ভের প্রাচীন অক্ষরের মতো আকার ধরেছে, পড়িয়ে নিতে গেলে রাখাল বাঁড়ুজ্জের শরণ নিতে হয়। এই জন্যে সেই চিঠিখানার প্রত্যক্ষরীকরণে প্রবৃত্ত হোতে হোলো। এইটুকু গেল আজকের তারিখের অন্তর্গত। নিচে বিগত কল্যকার বাণী :—

আজ তোমাদের বিবাহের সাম্বৎসরিক। এদিন তোমাদের জন্মদিনের চেয়ে বড়ো দিন। সম্মিলিত জীবনের সৃষ্টির প্রথম দিন। সকল সৃষ্টির মূলে একটা দ্বৈততত্ত্ব আছে। মানুষের সংসাররচনার গোড়ায় দুই জীবনের গ্রন্থিবন্ধন চাই। উপনিষদে আছে এক বললেন আমি বহু হব, তার থেকে বিশ্ব সৃষ্টি। মানুষের জীবনে বহু বললে আমি এক হব তার থেকে মানুষের সমাজ, দুই বললে আমি এক হব তার থেকে মানুষের সংসার। তার পর থেকে সুখে দুঃখে ভালোয় মন্দয় বৈচিত্র্যের আর অন্ত নেই। আমি পূর্বে লিখেছি সৃষ্টির মূলে দ্বৈততত্ত্ব—কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ নয়—দ্বৈত এবং অদ্বৈতের সমন্বয়ই সৃষ্টি। তোমাদের মধ্যে এই দ্বৈত অদ্বৈতের সমন্বয়-

রহস্য সার্থক হোক এবং জীবনের বিকাশ বৈচিত্র্যে সম্পদশালী হয়ে উঠুক।

* * * * * *

খড়্গপুর থেকে বোম্বাই পর্যন্ত একলা গাড়িতে বসে যখন চলছিলুম তখন নানা দুঃখের ভাবনার ভিতর দিয়েও নিজের অন্তরের চলতি স্রোতের মানুষটাকে উপলব্ধি করেছি। সেই আমার বলাকার কবি। দীর্ঘকাল এক জায়গায় বসে বসে এর কথা ভুলে যাই, চারদিকে আবরণ জেগে ওঠে, নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপকে দেখতে পাইনে। চারিদিকে নানা লোকের নানা ইচ্ছার ভিড়ে ধুলো পড়ে, ধুলো জমে। ক্রমে তারই অবরোধের ভিতরকার সংকীর্ণ জগৎটা একান্ত হয়ে ওঠে, নিজের প্রকাশও সেই সঙ্গে সংকীর্ণ ও বিমিশ্র হয়। হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এসে এক মুহূর্তেই বুঝতে পারি বিশ্বে আমার স্থান আছে, প্রয়োজন আছে, অতএব মানবলোকে আমার জীবন সার্থক হয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের দিকেও আমি যে বঞ্চিত হয়েছি তা নয়। আমার ব্যক্তিগত সত্তার প্রতি আমার নিজের শ্রদ্ধা নেই। যেখানে আমি বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত সেইখানেই আমার মূল্য। যেখানে আমি নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যে স্বতন্ত্র সেখানে আমি অকৃতার্থ—সেখানেও আমি যা কিছু দান পেয়েছি সে আমার প্রাপ্যের অতীত। সংসার থেকে বিদায় নেবার পূর্বে সেজন্যে আমার কৃতজ্ঞতা রেখে যাব।

এই কিছুক্ষণ আগে বোম্বাই পৌঁছিয়ে অম্বালালের

আতিথ্যভোগ করছি। তিনি আমাদের হোটেলে রেখেছেন। সঙ্গীরা শহরের মধ্যে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতা থেকে কোনো খবর পাইনি। সুধাকান্ত আসবে কিনা জানি না। দৈবক্রমে তারই হাতে আমার সমস্ত বাক্সের চাবি। হোটেলে এসেই নতুন চাবি সংগ্রহের কাজে লেগেছি। তত-ক্ষণকার মতো ভদ্রতা বাঁচিয়ে চলবার সরঞ্জাম কিছু কিছু আছে।

জাহাজ এখনো আসেনি। আগামী কাল বেলা একটার সময় আসবে—চারটের আগে ছাড়বে না। অন্য সব ভাবনা ছেড়ে যে দিকে চলেছি সেই দিকের ভাবনা এখন থেকে ভাবতে আরম্ভ করব। ইতি ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯।

২৯

মানুষ মাকড়ষারই মতো। সে নিজের অন্তর থেকেই হাজার হাজার সূক্ষ্ম সূত্র বের করে জাল বাঁধে, নিজের অব্যবহিত পরিবেশের সঙ্গে নিজের বিশেষ সম্বন্ধ ধ্রুব করতে চেষ্টা করে। যখন সেই বাসা বাঁধে, গ্রন্থি এমন পাকা করে আঁটতে থাকে যে ভুলে যায় যে বারে বারে এগুলো ছিন্ন করতে হবে। এই জন্যেই যখন দূরে যাত্রা করবার সময় আসে তখন খোঁটা ওপড়ানো ও রসি টেনে ছেঁড়া এত কঠিন হয়ে ওঠে। মানুষ যখন বাড়ি তৈরি করে তখন নিজেকে মনে মনে আপন সুদূর ভাবি কালে বিস্তার করে দেয়—যে কালের মধ্যে তার নিজের স্থান নেই। তাই পয়লা নম্বরের ইঁট ও সেরা মার্কার দামী সিমেণ্ট ফরমাশ করে—তার নিজের ইচ্ছের কঠিন স্তূপটাকে উত্তর কালের হাতে দিয়ে যায়, সেই কাল সেটার গ্রন্থি শিথিল করতে লেগে যায় নয় তো নিজের চলতি ইচ্ছের সঙ্গে সেই স্থাবর ইচ্ছেটার মিল করবার জন্য নানা-প্রকার কসরৎ করতে থাকে। বস্তুত মানুষের বাস করা উচিত সেই তাঁবুতে যে তাঁবুর পত্তন মাটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে না এবং পাথরের দেয়াল উঁচিয়ে মুক্ত আকাশকে মুষ্টিঘাত করতে থাকে না। আমাদের দেহটাই যে আলগা বাসা, আমাদের যাযাবর আত্মার উপযোগী, ত্যাগ করবার সময় এলে সেটাকে কাঁধে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় না। এই জন্যেই আমি তোমাকে অনেকবার পরামর্শ দিয়েছি ইটকাঠের বাঁধন

দিয়ে অচল ডাঙার উপর বাড়ি তৈরি কোরো না—স্রোতের উপর সচল বাসার ব্যবস্থা করো—যখন স্থির থাকতে চাও একটা নোঙর নামিয়ে দিলেই চলবে—আবার যখন চলতে চাও তখন নোঙরটাকে টেনে তোলা খুব বেশি কঠিন হবে না। আমাদের কালস্রোতে ভাসা জীবনের সঙ্গে বাসাগুলোর সামঞ্জস্য থাকে না ব'লেই টানা ছেঁড়ায় পদে পদে দুঃখ পেতে হয়। আমাদের বাসাগুলোর মধ্যে দুটো তত্ত্বই থাকা চাই স্থাবর এবং জঙ্গম। থাকবার বেলা থাকতে হবে ফেলবার বেলা ফেলতে হবে—আত্মার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধের মতো। এ সম্বন্ধ সুন্দর কারণ এটা ধ্রুব নয়। সেইজন্য নিয়তই দেহের সঙ্গে দেহীর বোঝাপড়া করতে হয়। সাধনার অন্ত নেই; এর বেদনা আর আনন্দ সমস্তই অধ্রুবতার স্রোত থেকেই আবর্তিত,—এর সৌন্দর্যও সকরুণ, তার উপরে মৃত্যুর ছায়া। কালের এবং ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এর পরিবর্তন।

সংসারে আমাদের সব বাসাই এমনি হওয়াই ভালো। আমার ধ্যান যে রূপকে আশ্রয় করেছে পরের হাতে নিজেকে বেচবার জন্য সে যেন সেজেগুজে লোভনীয় হয়ে না বসে থাকে। নিজেকে সম্পূর্ণ করে তার পরে অন্যকালের অন্য লোকের তপস্যাকে ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিয়ে যেন একেবারেই সরে দাঁড়ায়। নইলে কালের পথ রোধ করতে চেষ্টা করলে তার দুর্গতি ঘটতে বাধ্য। টাকার জোরে আমরা আমাদের ধ্যানের রূপটাকে বেঁধে দিয়ে যেতে ইচ্ছে করি।

তার মধ্যে অন্য পাঁচজনের ধ্যান যখন প্রবেশ করতে চেষ্টা করে তখন সেটা বেখাপ হোতেই হবে। আমার উচিত ছিল বিশ্বভারতীর সম্পূর্ণতা সাধনের জন্যে বিশ্বভারতীর শেষ টাকা ফুঁকে দিয়ে চলে যাওয়া। তার পরে নতুন কাল নিজের সম্বল ও সাধনা নিয়ে নিজের ধ্যানমন্দির পাকা করুক। আমার সঙ্গে মেলে তো ভালো যদি না মেলে তো সেও ভালো। কিন্তু এটা যেন ধার করা জিনিস না হয়। প্রাণের জিনিসে ধার চলে না—অর্থাৎ তাতে প্রাণবান কাজ হয় না—আমগাছ নিয়ে তক্তপোষ করা চলে কিন্তু কাঁঠালব্যবসায়ী তা নিয়ে কাঁঠাল ফলাতে চেষ্টা যেন না করে। এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে মা গৃধঃ।

আমি যে কথাটা বলতে বসেছিলুম সেটা এ নয়। তোমরা তাঁবুতে থাকবে কিংবা নৌকোতে থাকবে সে পরামর্শ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার হাল খবরটা হচ্ছে এই যে কাল যখন জাহাজে ছড়েছিলুম তখন মনটা তার নতুন দেহ না পেয়ে থেকে থেকে ডাঙা আঁকড়ে ধরছিল—কিন্তু তার দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটেছে। তবুও নতুন দেহ সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে কিছুদিন লাগে। কিন্তু খুব সম্ভব কাল থেকেই লেকচার লিখতে বসতে পারব। সেটাকে বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ নতুন ঘরকন্না পাতানো। যে পার ছেড়ে এলুম সে পারের সঙ্গে এর দাবিদাওয়ার সম্পর্ক নেই। এর ভাষাও স্বতন্ত্র। বাজে কথা গেল। এবার সংবাদ শুনতে চাও। আজ সাতটা পর্যন্ত অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলুম। ক্লান্তি যেন

অজগর সাপের মতো আমার বুক পিঠ জড়িয়ে ধরে চাপ দিচ্ছিল। তার পর থেকে নিজেকে বেশ ভদ্রলোকেরই মতো বোধ হচ্ছে। যুগল ক্যাবিনের অধীশ্বর হয়ে খুশি আছি। পূর্ব ক্যাবিনে দিন কাটে পশ্চিম ক্যাবিনে রাত্রি অর্থাৎ আমার আকাশের মিতার পন্থা অবলম্বন করেছি—পূর্বদিগন্তে ওঠা পশ্চিমদিগন্তে পড়া। আমার সহচরত্রয় ভালোই আছে—ত্রিবেণী-সংগমের মতো—উত্তর প্রত্যুত্তর হাস্য প্রতিহাস্যের কলধ্বনি তুলে তাদের দিন বয়ে চলেছে। আমি আছি ঘরে, তারা আছে বাইরে। অপূর্ব মনে করেছে এখানে আমার যা কিছু সুযোগ সুবিধা সমস্তই তার নিজের ব্যবস্থার গুণে। আমি তার প্রতিবাদ করিনে—প্রতিবাদের অভ্যাসটা খারাপ—স্থানবিশেষে সংসারে ছোটো ছোটো অসত্যকে যারা মেনে নিতে পারে না তারা অশান্তি ঘটায়। এইজন্যেই ভগবান মনু বলেছেন—সে কথা যাক। ইতি ২ মার্চ, ১৯২৯।

৩০

জাহাজ জিনিসটাই আগাগোড়া চলে, কিন্তু আর সব চলাকেই সে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এই বাসাটুকুর বেড়ার মধ্যে সময়ের গতি অত্যন্ত মন্দবেগে। সময়ের এই মন্দাক্রান্তা ছন্দে যে সব ঘটনা অত্যন্ত প্রধান হয়ে প্রকাশ পায় অন্যত্র ছন্দের বেগে সেগুলো চোখেই পড়তে চায় না। এই মুহূর্তেই ডাঙার মানুষ যে সব খেলা খেলছে তা প্রচণ্ড খেলা —জীবন মরণ নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি। জাহাজের ছাদে দুই পক্ষের খেলোয়াড় বিড়ে নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। তাতেই উৎসাহ উত্তেজনার অন্ত নেই। এই সব দেখলে একথা স্পষ্ট করেই বোঝা যায় যে স্থানান্তরকে লোকান্তর বলে না। বিশেষ বিশেষ বেড়া বেঁধে সময়ের গতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে আমাদের জগতের বিশেষত্ব ঘটাই। তার মানেই হচ্ছে ছন্দ বদল হোলেই রূপের বদল হয়। আমি এবং আমার প্রতিবেশী ইংরেজ এক জায়গায় বাস করি কিন্তু এক জগতে নয়। তার মানে তার জীবনে কালের ছন্দ আমার থেকে স্বতন্ত্র। সেই জন্যেই তার খেলার সঙ্গে আমার খেলার তাল মেলে না। আমি ঠেলাগাড়িতে চলছি, সে মোটরে চলছে—আমাদের উভয়ের সময়ের পরিমাণ এক, লয় আলাদা। বস্তুত এক হোলেও ঝাঁপতালে এবং ঢিমেতেতালায় তার মূল্য সম্পূর্ণ বদলে দেয়। মানুষে মানুষে সুরের ঐক্য থাকতেও পারে; সব চেয়ে বড়ো অনৈক্য তালের। তালের দ্বারা জীবনের ঘটনা-

গুলোকে ভাগ করে, সাজায়, বিশেষ বিশেষ জায়গায় ঝোঁক দেয়। একেই বলে সৃষ্টি। জগৎ জুড়ে এই ব্যাপার চলছে। মহাকালের মৃদঙ্গ এক এক তাণ্ডব ক্ষেত্রে এক এক তালে বাজছে, সেই নৃত্যের রূপেই রূপের অসংখ্য বৈচিত্র্য। আমার জীবনের নটরাজ আমার মধ্যে যে নাচ তুলেছেন, সে আর কোথাও নেই—কোনো জীবনচরিতের পটে এর সম্পূর্ণ ছবি উঠবে কী করে। কোনো কালেই উঠবে না। আমাদের আর্টিস্ট যা গড়েন তার নব নব সংস্করণ ঘটতে দেন না, সাজানো টাইপ ভেঙে ফেলেন—অতএব রবীন্দ্রনাথ নিরবধিকালের চয়নিকায় একবার ধরা দেয়, তার পর তাকে ফেলে দেওয়া হয়—অনন্তকালে আর রবীন্দ্রনাথ নেই। হয়তো পরকালে আর একটা ধারা চলতে পারে, কিন্তু তার এ নাম নয়, এ রূপ নয়, এ পরিবেশ নয়, এ সমাবেশ নয়; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পালা এইখানেই চিরকালের মতো চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। আর যাই হোক বিশ্বসভায় কারো মেমোরিয়াল মিটিং হয় না। হয় কেবল আগমনী এবং বিসর্জন। আজ রাত্রে পিনাঙ। ইতি ৭ই মার্চ, ১৯২৯।

৩১

চলেছি। নতুন নতুন মেয়ে পুরুষের সঙ্গে আলাপ চলেছে। আলাপ জমতে না জমতে আবার ঘাটে ঘাটে মানুষ বদল হচ্ছে। অর্থাৎ দিনের পর দিন যাদের নিয়ে সময় কাটছে তারা যেন এমন জীব যাদের ভিতরটা নেই কেবল উপরটা আছে—যা ধাঁ করে চোখে পড়ে, মনের উপর ছায়া ফেলে সেইটুকু মাত্র। কেদারার পিঠে তাদের নামের ফলক ঝুলছে, আর তারা কেদারার উপর পা ছড়িয়ে বসে আছে,—তারা আর কোথাও নেই কেবল ঐটুকুর উপরে। আমার সঙ্গে কেবল তিনজনমাত্র মানুষ আছে যারা জায়গা ওদের চেয়ে বেশি জোড়ে না, কিন্তু যারা অনেকখানি,—যাদের সত্যতা, দৃশ্য অদৃশ্য বহু সাক্ষ্যের দ্বারা আমার মনের মধ্যে চারদিক থেকে প্রমাণীকৃত—এই জন্যে যাদের কাছ থেকে অনেকখানি পাই এবং যারা সরে গেলে অনেকখানি হারাই। যারা তাসের উপরকার ছবির মতো একতলবর্তী নয় যাদের মধ্যে পূর্ণায়তন জগতের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ণায়তন জগতেই বাস্তবতার স্বাদ পাওয়া আমাদের অভ্যাস, তার চেয়ে কম পড়লে দুধের বদলে এক বাটি ফেনা খাবার চেষ্টা করার মতো হয়। যতটা চুমুক দিলে আমরা জানার পুরো স্বাদ পাই এই জাহাজভরা যাত্রীদের মধ্যে তা পাবার জো নেই। —এই কারণে আমাদের পেট ভরে জানার অভ্যাস পীড়িত হচ্ছে। কিছুদিনের উপবাসে ক্ষতি হয় না কিন্তু বেশিদিন এমন অত্যল্প জানার খোরাকে চলে না। আত্মীয়ের মধ্যে

আমাদের জানার ভরপুর খোরাক মেলে ব'লেই তাতে আমরা এত আরাম পাই। কেন এই কথাটা এমন জোরে মনে এল সেই কথাটা খুলে বলি। আজ বিকেলে সিঙ্গাপুরের ঘাটে জাহাজ থামতেই সরযূ জাহাজে এসে উপস্থিত। আমি তাঁকে গতবারে অল্প কয়দিনমাত্র দেখেছিলুম, সুতরাং তাঁকে সুপরিচিত বললে বেশি বলা হবে। কিন্তু তাঁকে দেখে মন খুশি হোলো এইজন্যে যে তিনি বাঙালি মেয়ে অর্থাৎ এক মুহূর্তে অনেকখানি জানা গেল—তাঁর সরযূ নাম বিয়াট্রীস বা এলিয়োনোরের মতো পরিচয়সূচক নয়, আমার পক্ষে তাতে তার চেয়ে অনেক বেশি পদার্থ আছে। তার পরে তাঁর শাড়ী, তাঁর বালা, তাঁর কপালের মাঝখানের কুঙ্কুমের বিন্দু, কেবলমাত্র দৃশ্যগত নয়, তার পিছনে অনেকখানি অদৃশ্য সামগ্রী আছে এক নিমিষেই সেই সমস্ত এসে চোখ এবং মনকে ভরে ফেলে। ভালো করে ভেবে দেখো এই সমস্ত চিহ্ন, বচনীয় এবং অনির্বচনীয় কত বিচিত্র পদার্থকে সংক্ষেপে একই কালে বহন করে, তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে গেলে আঠারো পর্ব বই ভর্‌তি হয়ে যায়। এ জাহাজে অনেক মেয়ে আছে তাদের মধ্যে এই বাঙালি মেয়েকে দেখে মন এত খুশি হোলো —তার কারণ আর কিছু নয়,জানতেই মনের আনন্দ, মন যখন ব'লে জানলুম তখন সে খুশি হয়, আমরা যাকে বলি মন-কেমন করা তার মানে হচ্ছে চারিদিকের জানা পদার্থটা যথেষ্ট পূর্ণায়তন নয়। ইতি ১০ মার্চ, ১৯২৯।

৩২

সেদিন হঠাৎ এক সময়ে জানিনে কেন ছেলেবেলাকার একটা ছবি খুব পষ্ট করে আমার মনে জেগে উঠল। শীতকালের সকাল বোধ হয় সাড়ে পাঁচটা। অল্প অল্প অন্ধকার আছে। চির অভ্যাসমতো ভোরে উঠে বাইরে এসেছি। গায়ে খুব অল্প কাপড়, কেবল একখানা সুতোর জামা এবং ইজের। এই রকম খুব গরীবের মতোই আমাদের বাল্যকাল কেটেছে। ভিতরে ভিতরে শীত করছিল—তাই একটা কোণের ঘর, যাকে আমরা তোষাখানা বলতুম, যেখানে চাকররা থাকত—সেইখানে গেলুম। আধা অন্ধকারে জ্যোতিদার চাকর চিন্তে লোহার আঙটায় কাঠের কয়লা জ্বালিয়ে তার উপরে ঝাঁঝরি রেখে জ্যোদার জন্যে রুটি তোস করছে। সেই রুটির উপর মাখন গলার লোভনীয় গন্ধে ঘর ভরা। তার সঙ্গে ছিল চিন্তের গুন গুন রবে মধুকানের গান, আর সেই কাঠের আগুন থেকে বড়ো আরামের অল্প একটুখানি তাত। আমার বয়স বোধ হয় তখন নয় হবে। ছিলুম স্রোতের শেওলার মতো—সংসার প্রবাহের উপরতলে হালকাভাবে ভেসে বেড়াতুম—কোথাও শিকড় পৌঁছয়নি—যেন কারো ছিলুম না, সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত চাকরদের হাতেই থাকতে হোত, কারো কাছে কিছুমাত্র আদর পাবার আশা ছিল না। জ্যোদা তখন বিবাহিত, তাঁর জন্যে ভাববার লোক ছিল, তাঁর জন্যে ভোরবেলা থেকেই রুটি তোস আরম্ভ। আমি ছিলুম সংসার-

পদ্মার বালুচরের দিকে, অনাদরের কূলে—সেখানে ফুল ছিল না, ফল ছিল না, ফসল ছিল না—কেবল একলা বসে ভাববার মতো আকাশ ছিল। আর জ্যোদা পদ্মার যে কূলে ছিলেন, সেই কূল ছিল শ্যামল—সেখানকার দূর থেকে কিছু গন্ধ আসত, কিছু গান আসত, সচল জীবনের ছবি একটু আধটু চোখে পড়ত। বুঝতে পারতুম ঐখানেই জীবনযাত্রা সত্য। কিন্তু পার হয়ে যাবার খেয়া ছিল না—তাই শূন্যতার মাঝখানে বসে কেবলি চেয়ে থাকতুম আকাশের দিকে। ছেলেবেলায় বাস্তব জগৎ থেকে দূরে ছিলুম ব'লেই তখন থেকে চিরদিন "আমি সুদূরের পিয়াসী"। অকারণে ঐ ছবিটা অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে মনে জেগে উঠল। তার পরে ভেবে দেখলুম, সেদিন আমিই ছিলুম ছায়ার মতো, আমার সংসারে বস্তু ছিল না, ঘরে ছিল না আত্মীয়তা, বাইরে ছিল না বন্ধুত্ব। জ্যোতিদাদা ছিলেন নিবিড়ভাবে সত্য, তাঁর সংসার ছিল নিবিড়ভাবে তাঁর নিজের। সেদিন মনে করা অসম্ভব ছিল এই যেটুকু দেখছি যা ঘটছে এর কিছু ব্যত্যয় হোতে পারে। পূর্ণতার চেহারা দেখা যেত কিছুতেই ভাবা যেতে পারত না তার কোনো কালে অন্ত আছে। সেদিনকার সেই রুটিতোস-সুগন্ধি সকালবেলা যে পূর্ণজীবনের রূপক ছিল সেদিন আমার সমস্ত জীবনে তার সমতুল্য কিছুই ছিল না। কিন্তু কোথায় সেই সকাল, সেই গুন গুন গান-করা চিন্তে চাকর—আর জ্যোদা, তাঁর যা কিছু সমস্ত নিয়ে কোথায়। আজ সেই শীতের সকালের অনাদৃত রবি জাহাজে চড়ে চলছে

বৃহৎ জগতে। সেদিনের সব চেয়ে যা সত্য তার কোনো চিহ্ন নেই, আর সব চেয়ে যা ছায়া তা আজ অদ্ভুত রকমে প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। আবার মনে হচ্ছে আজকের দিনের সমস্ত কিছু যেন এই ভাবেই বরাবর চলবে, পরিবর্তনের কথা মনে করা যায় কিন্তু মস্ত ফাঁকগুলোর কথা কল্পনায় আনতে পারিনে; তবু চলতে চলতে এমন একটা বিশেষ দিন আসে রাত্রি আসে যখন একটানা রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ মস্ত একটা গহ্বর দেখা দেয়, মনে করা যায় না এমন ফাঁক জীবনে সইবে কী করে, তার পরে তার উপর দিয়েও সময়ের রথ অনায়াসে পার হয়ে যায়, তার পরে সেই রথের চিহ্নটাও যায় মুছে। অত্যন্ত পুরোনো কথা কিন্তু অত্যন্ত অদ্ভুত কথা,—একটা ধারা চলেইছে, যেটা চিরকালই আছে অথচ পদে পদেই নেই—'সমস্ত' ব'লে মস্ত একটা কিছু আছে অথচ তার প্রত্যেক অংশটাই থাকছে না—একদিকে সে মায়া তবু আর একদিকে সে সত্য। ইতি ১৪ মার্চ, ১৯২৯।

৩৩

কাল জাপানি বন্দরে এসেছি—নাম মোজি। আগামী কাল পৌঁছব কোবে। পাখি বাসা বাঁধে খড়কুটো দিয়ে, সে বাসা ফেলে যেতে তাদের দেরি হয় না—আমরা বাসা বাঁধি প্রধানত মনের জিনিস দিয়ে কাজে কর্মে, লেখা পড়ায়, ভাবনা চিন্তায় চারদিকে একটা অদৃশ্য আশ্রয় তৈরি হোতে থাকে। হাওয়াগাড়ির গদি যেমন শরীরের মাপে টোল খেয়ে খোঁদলগুলি গড়ে তোলে,—মন তেমনি নড়তে চড়তে তার হাওয়া-আসনে নানা আকারের খোঁদল তৈরি করে, তার মধ্যে যখন সে বসে তখন সে বসে যায়—তারপরে যখন সেটাকে ছাড়তে হয় তখন আর ভালো লাগে না। এ জাহাজে আমার তেমনি ঘটেছে। এই ক্যাবিনে এক পাশে একটি লেখবার ডেস্ক, আর এক পাশে বিছানা, তাছাড়া আয়নাওয়ালা দেরাজ আর কাপড় ঝোলাবার আলমারি, এর সংলগ্ন একটি নাবার ঘর এবং সেটা পেরিয়ে গিয়ে আর একটা ক্যাবিন, সেখানে আমার বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি। এরই মধ্যে মন নিজের আসবাব গুছিয়ে নিয়েছে। অল্প জায়গা ব'লেই আশ্রয়টি বেশ নিবিড়, প্রয়োজনের জিনিস সমস্ত হাতের কাছে। এখান থেকে নেমে দুদিনের জন্য সাংহাইয়ে সু-র বাড়িতে ছিলুম, ভালো লাগেনি, অত্যন্ত ক্লান্ত করেছিল, তার প্রধান কারণ নূতন

জায়গায় মন তার গায়ের মাপ পায়নি, চারদিকে এখানে ঠেকে ওখানে ঠেকে আর তার উপরে দিনরাত আদর অভ্যর্থনা গোলমাল।

প্রতিদিনের ভাবনা কল্পনার মধ্যেই নতুনত্ব আছে, বাইরের নতুনত্ব তাকে বাধা দিতে থাকে। জীবনে আমরা যে কোনো পদার্থকে গভীর করে পেয়েছি অর্থাৎ অনেকদিন অনেক করে জেনেছি সত্যিকার নতুন তারি মধ্যে,—তাকে ছেড়ে নতুনকে খুঁজতে হয় না। অন্য সব মূল্যবান জিনিসেরই মতো নতুনকে সাধনা করে লাভ করতে হয়। অর্থাৎ পুরোনো করে তবে তাকে পাওয়া যায়। হঠাৎ যাকে পেয়েছি ব'লে মনে হয়, সে ফাঁকি, দুদিন বাদেই তার যথার্থ জীর্ণতা ধরা পড়ে। আজকের দিনে এই সস্তা নতুনত্বের মৃগয়ায় মানুষ মেতেছে, সেইজন্যেই মুহূর্তে মুহূর্তে তার বদল চাই। তার এই বদলের নেশায় বিজ্ঞান তার সহায়তা করছে, সে সময় পাচ্ছে না গভীরের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে চিরনূতনের পরিচয় পেতে। এই জন্যেই চারিদিকে একটা পুঁথিপড়া ইতরতা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। ধ্রুবসত্যকে সত্যরূপে পাবার সময় নেই, সময় নেই। সাহিত্যে যে অশ্লীলতা দেখা দিয়েছে তার কারণ এই ; অশ্লীলতা অতি সহজেই প্রবলবেগে মনকে আঘাত করে, যাদের সময় নেই ও শক্তি কম তাদের পক্ষে অতি দ্রুতবেগে আমোদ পাবার এই অতি সস্তা উপায়। তীব্র উত্তেজনা চাই সেই মনেরই পক্ষে যে মন নির্জীব, যে মনের জীবনীশক্তি কমে গেছে অগভীর মাটিতে—তার শিকড়গুলি উপবাসী। ইতি ৯ই চৈত্র, ১৩৩৫।

আশ্চর্য হবে যখন এই চিঠি লিখছিলুম অত্যন্ত ঘুম পাচ্ছিল সেই ঘোর ঠেলতে ঠেলতে লেখা এগোচ্ছিল। এখনো ঘোর ছাড়েনি। অথচ এখন সকালবেলা, এগারোটা বেজেছে— যাই স্নান করতে।

৩৪

কাল রাত্তিরে টোকিয়োতে এসে এক বিখ্যাত হোটেলে আশ্রয় নিয়েছি। বিখ্যাত হোটেলগুলি যে অর্থসম্বল কিংবা আরামের পক্ষে উপযোগী তা নয়, কিন্তু যেহেতু দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও বিখ্যাত সেই জন্যে আমাকে আমার বিখ্যাত সমান মাপের উপদ্রব সহ্য করতে হয়। ছোটো জায়গায় লুকোনো সহজ, কিন্তু জগতে আমার লুকোবার পথ বন্ধ। একদিন জনতার হাত থেকে আত্মরক্ষা আমার অত্যাবশ্যক হবে একথা একদা কল্পনা করতেও পারতুম না, সেই যেদিন ছিলুম আমার পদ্মার চরে বোটের মধ্যে একাকী। তাই লোক ঠেকিয়ে রাখবার অভ্যাস আমার হয়নি, যে খুশি এসে আমাকে টানা-হেঁচড়া করতে পারে। আজ সকালে যখন ক্লান্ত হয়ে বসেছিলুম একজন আমাকে নানা কথায় ভুলিয়ে মোটর চড়িয়ে গলির মধ্যে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। শেষকালে দেখি তাদের সঙ্গে ফটোগ্রাফ তুলিয়ে নেবার জন্য এই উৎপাত।

আমরা প্রথম জন্মেছিলুম সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে, আপন ঘরে, আপন মানুষের আদর যত্নের পরিবেষ্টনে। তখন ছিলুম সম্পূর্ণ বেসরকারী। তখন আড়াল ব'লে একটা অত্যন্ত আপন জিনিস ছিল। ক্রমে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সংসারের সম্পর্ক বাড়তে লাগল। কিন্তু যতই বাড়ুক তার একটা সহজ পরিমাণ ছিল। তাই বেসরকারী

আমি এবং সরকারী আমির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ছিল। অবশেষে দৈবদুর্যোগে অসাধারণ ব'লে খ্যাতি বাড়তে লাগল, আমি যতটা বেসরকারী তার চেয়ে অনেক বেশি সরকারী হয়ে উঠলুম—যে আড়ালটুকুর অধিকার আমার ছিল তাতে এখন আর কুলোয় না। অত্যন্ত পাকা ফলের মতো আমার উপরকার শক্ত খোসাটুকু সাতখানা হয়ে ফেটে গেছে, এখন যে-কোনো আগন্তুক পাখি যে মৎলবেই হোক এসে ঠোকর দিতে পারে কোনো বাধা নেই। ক্ষতি ছিল না যদি এতে তাদের সত্যিকার উপকার হোত। আমার উপর দিয়ে তারা নিজেদের লোভ মিটিয়ে নিতে চায়, নিক—কিন্তু এতে আমার যে গুরুতর ক্ষতি হয় ভেবে দেখতে গেলে সে ক্ষতি তাদেরও। ছোটো ছোটো দাবির আঘাতে চিত্ত বিপর্যস্ত হয়, নিজের যথেষ্ট কাজ করবার শক্তির অপব্যয় হোতে থাকে। তা ছাড়া যখন বুঝতে পারি আমি অন্যের স্বার্থের বাহন হয়ে পড়েছি এবং সে স্বার্থও তুচ্ছ তখন বড়ো ধিক্কার লাগে, বড়ো ইচ্ছে করে আপনার সেই সাবেক খ্যাতিহীন ছোটো বাসার মধ্যে ফিরে যাই, এবং যারা কেবলমাত্র আমার অস্তিত্বের মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে তাদের কাছেই আশ্রয় নিই। অথচ মাঝে মাঝে এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয়, যারা আমার অপরিচিত, অথচ যারা দূরের থেকে আমাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে। তারা আমার কাছে কিছুই চায় না—তারা খ্যাতির দ্বারা আমাকে বিচার করে না। তারা নিজের আনন্দের দ্বারা আমাকে স্বীকার করে। এর চেয়ে সৌভাগ্য

আর কিছু হোতে পারে না। এবারে কোবে শহরে যখন আমার স্বদেশীয়দের অবাস্তব সস্তা সম্মাননার দ্বারা পীড়িত হচ্ছিলুম তখন ওখানকার ইংরেজ কন্সালের স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে অনেক দুঃখ দূর হোলো। অনুভব করলুম কোনো কোনো লোকের পক্ষে আমার কর্ম গভীরভাবে সফল হয়েছে—তাঁরা আমার অগোচরেই আমার কাছ থেকে যা পেয়েছেন তার চেয়ে আর কিছু চান না।

আজ টোকিয়োতে আমার তিনটে নিমন্ত্রণ আছে—বেলা একটা থেকে রাত্রে ডিনার পর্যন্ত গড়াবে। তার পর মোটর করে য়োকোহামায় যাব—তার পরে কাল ভারতীয়দের নিমন্ত্রণে মধ্যাহ্নভোজন সেরে বেলা তিনটের সময় কানাডায় পাড়ি দেব। তার পরে জানিনে। ২৭ মার্চ, ১৯২৯।

৩৫

ঘোর বর্ষা নেমেছে। এমনতরো বাদলে আমার মনের শিখরদেশে প্রায়ই সুরের মেঘ ঘনিয়ে আসে আর হৃদয়ের মধ্যে পেখম-মেলা ময়ূরের নাচও শুরু হয়। কিন্তু এবারে কী হোলো, এখনো আষাঢ়ের আহ্বানে আমার অন্তর সাড়া দিল না। হয়তো ছবি আঁকতে যদি বসি তাহলে কলম সরবে কিন্তু কাব্যভাবনার স্পর্শে তাকে চঞ্চল করতে পারছে না। এসে অবধিই কেমন আমার মনে হচ্ছে দেশের হাওয়ায় আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে গেছে, এখানে দরজা খোলা হোলো না। বুঝি সেই জন্যেই কী ভাবা, কী লেখা, কী কাজ করা কিছুই সহজ হয়ে উঠছে না, সামান্য কর্তব্যগুলোও মনকে ভারাক্রান্ত করছে। কিছুকাল পূর্বে এমন একদিন ছিল যখন আমার মনের নিভৃত দেশে একটি পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তখন সংসারের সমস্ত বিক্ষোভ থেকে সেইখানে প্রতিদিন যাতায়াত করবার একটি যেন পায়ে চলা পথ তৈরি হয়ে আমাকে আমার কাছ থেকে দূরে আনতে পেরেছে। তার পরে নানা কঠিন চিন্তা, নানা জটিল কাজ, নানা চিত্ত-বিক্ষেপ আমাকে কোথায় সরিয়ে নিয়ে গেছে—সে-পথের নাগাল পাচ্ছিনে। চিত্তের মধ্যে যেখানে গভীরতা সেখানে প্রতিষ্ঠালাভ করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাড়ায় বিচলিত করতে পারে না। সেখানে "আমি"-নামক উৎপাতটা সাহস করে ঢুকতে চায় না। সেইখানকার বেদীর নিচে অচঞ্চল আসন পেতে বসবার জন্যে আজকাল আমাকে কেবলি তাগিদ করছে।

এই বেদনাও ভালো কিন্তু উদাসীনতা ভালো নয়। মনে করছি দেশের হাওয়ায় যে-সব ছোটো কথার ঝাঁক গুঞ্জন ক'রে বেড়ায় তাদের কাছ থেকে মনটাকে অবরুদ্ধ করব—চিরন্তনের নির্মল নিঃশব্দতার মাঝখানে ব'সে নিজের অন্তরতম সত্য বাণীকে নিজের কাছে উদ্ধার করে আনব। এই জায়গাতে সঙ্গ পাবার আশা নেই, একলা মনের প্রদীপ জ্বালতে হবে। একদা সঙ্গের অভাবটাকে অনুভব করিনি—আপনার মধ্যেই আপনার নিরন্তর একটা পূর্ণ দরবার জমেছিল। তার পরে কখন বুঝি শরীরের দুর্বলতার সঙ্গে আমার চিত্তলোকের আলোক কমে এল তখনি আপনার মধ্যে সঙ্গলাভ করবার শক্তি ম্লান হয়ে এসেছে, তখনি থেকেই বাইরের সঙ্গকে আগ্রহের সঙ্গে ইচ্ছা করেছি। কিন্তু আমার সত্যকার স্বভাবটা বোধ হয় নৈঃসঙ্গিক—সঙ্গের প্রভাব তাকে বল দেয় না, তাকে অলস করে। এই আলস্যের মন্থরতায় নিজের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সে সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়—আর তার থেকেই আসে ক্লান্তি। এ পর্যন্ত আমি যা কিছু শক্তি পেয়েছি, যা কিছু শিক্ষা পেয়েছি সমস্তই একলা নিজের মধ্যে। আমি চিরদিনের ইস্কুল-পালানো ছেলে—জনহীন আকাশের ডাক শুনে যখনি গড়িমসি করেছি, যখনি সামনে না এগিয়ে পিছনে তাকিয়েছি তখনি বিপদ ঘটেছে। সেই ডাক আজ কানে এসে পৌঁছেছে—প্রদোষের আবছায়ায় পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। ইতি ২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৬।

৩৬

প্ল্যাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে—আকাশের দিগন্ত ঘিরে মেঘ জমেছে, তার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর পড়েছে পরিপুষ্ট শ্যামল পৃথিবীর উপরে। আজ আর বৃষ্টি নেই—হুহু ক'রে হাওয়া দিচ্ছে, সামনে পেঁপে গাছের পাতা কাঁপছে, আরো দূরে উত্তরের মাঠে আমার পঞ্চবটীর নিম-গাছের ডালে ডালে চলছে আন্দোলন, আর তার পিছনে একা দাঁড়িয়ে আছে তালগাছ, তার মাথায় যেন বিস্তর বকুনি। বেলা এখন আড়াইটে। আমার আবার দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে—উদয়নের দোতলায় বসবার ঘরের পশ্চিম পাশে যে-নাবার ঘর ছিল, প্রোমোশন হয়ে সেটাই হয়েছে বসবার ঘর—তার পাশের ছাতটুকুতে নাবার ঘরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মস্ত একটা টেবিল পেতে বসেছি—পিছনে দক্ষিণ দিকের আকাশ, সামনে উত্তর দিকের। আষাঢ় মাসের স্নাননির্মল স্নিগ্ধ মধ্যাহ্নটি এই দুদিকের খোলা জানলা দিয়ে আমার এই নির্জন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে ভাবছি কেন এমন দিনে বহু আগেকার দিনের একটা আভাস চিত্ত আকাশের দিক প্রান্তে অদৃশ্য কোন্ রাখালের মতো মূলতানে বাঁশি বাজায়। অর্থাৎ এ রকম দিন যেন বর্তমানের কোনো দায়কে স্বীকার করে না, এর কাছে জরুরী কিছুই নেই—যে-সব দিন একেবারে চলে গেছে এ তারি মতো বর্তমান ভবিষ্যতের বাঁধনছেঁড়া উদাসী—কারো কাছে কোনো জবাব-

দিহির ধার ধারে না। কিন্তু এই অতীত বস্তুত কোনোদিনই ছিল না—যা ছিল তা বর্তমান—তার প্রত্যেক মুহূর্ত বোঝা পিঠে সার বেঁধে চলেছিল তার হিসেব দিতে হয়েছে। "গত কাল" ব'লে যে-অতীত সে আজই আছে, গতকাল সে ছিলই না। স্বপ্নরূপিণী সে, বর্তমানের বাঁ পাশে ব'সে আছে—মধুর হয়ে উঠতে তার কোনো খরচ নেই। সেইজন্যেই বর্তমান কালের মধ্যে যখন কোনো একটা দিনের বিশুদ্ধ সুন্দর চেহারা দেখি তখন বলি সে অতীতকালের সাজ পরে এসেছে—প্রেয়সীকে বলি তুমি যেন আমার জন্মান্তরের জানা, অর্থাৎ এমন কালের জানা যে-কাল সকল কালের অতীত—যে-কালে স্বর্গ, যে-কালে সত্য যুগ—যে-কাল চির অনায়ত্ত। আজকের এই যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় বিজড়িত সুগভীর অবকাশের মধুতে ভরা মধ্যাহ্নটি সুদূর বিস্তৃত সবুজ মাঠের উপর বিহ্বল হয়ে পড়ে আছে এর অনুভূতির মধ্যে একটা বেদনা এই আছে-যে একে পাওয়া যায় না, ছোঁওয়া যায় না, সংগ্রহ করা যায় না—অর্থাৎ এ আছে তবুও নেই। সেইজন্যেই একে দূর অতীতের ভূমিকার মধ্যে দেখি। সেই অতীতের যা মাধুরী তা বিশুদ্ধ ; সেই অতীতে যা হারিয়েছে ব'লে নিঃশ্বাস ফেলি তার সঙ্গে এমন আরো অনেক হারিয়েছে যা সুন্দর নয় সুখকর নয়, কিন্তু সেগুলি অতীত নয়, তা বিনষ্ট—যা সুন্দর যা সুখের তাই চির অতীত—তা কোনোদিন মরে না, অথচ তার মধ্যে অস্তিত্বের কোনো ভার নেই। আজকের এই দিনটা সেই রকমের—এ আছে তবু নেই—

এই মধ্যাহ্নের উপর বিশ্বভারতীর কোনো দাবি নেই—এ গৌড়সারঙের আলাপ, যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন হিসাবের খাতায় কোনো অঙ্ক রেখে যাবে না।

দূর হোক গে, তবু বিশ্বভারতী আছে, কাজের কথাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। অতএব একটা কথা বিশেষ ক'রে প্রশান্তকে বোলো শনিবারে যখন আসবে আমার সব গদ্য-লেখার ঝুড়িটা যেন নিয়ে আসে। আমার সমস্ত লেখা সম্বন্ধে শেষ কর্তব্য সেরে দিয়ে যাবার অপরাহ্নকাল এসেছে—বিলম্ব করলে আর আলো দেখতে পাওয়া যাবে না। ইতি ৩২ আষাঢ়, ১৩৩৬।

তোমার ছশো টাকার ছবিতে আমার বিনামূল্যের কবিতা লিখে দেব।

৩৭

আমার চিঠিগুলো চিঠি নয় এই তর্ক উঠেছে। আমি নিজে অনেকবার স্বীকার করেছি যে আমি চিঠি লিখতে পারিনে। এটা গর্ব করবার কথা নয়। আমরা যে জগতে বাস করি সেখানে কেবল-যে চিন্তা করবার কিংবা কল্পনা করবার বিষয় আছে তা নয়। সেখানকার অনেকটা অংশই ঘটনার ধারা,—অন্তত যেটা আমাদের চোখে পড়ে, সেটা একটা ব্যাপার; সে কেবল হচ্ছে চলছে আসছে যাচ্ছে; অস্তিত্বের সদর রাস্তা দিয়ে চলাচল, তার ভিতরকার সব আসল খবর আমাদের নজরে পড়ে না। মাঝে মাঝে যদি বা পড়ে, তাদের ধরে রাখিনে, পথ ছেড়ে দিই; সমস্ত ধরতে গেলে মনের বোঝা অসহ্য ভারি হয়ে উঠত। আমাদের ঘরের ভিতর দিকটাতে সংসারের সংকীর্ণ দেয়াল-ঘেরা সীমানার মধ্যে আমাদের অনেক ভাবনার জিনিস, অনেক চেষ্টার বিষয় আছে তার ভার আমাদের বহন করতে হয়। কিন্তু যখন জানলায় এসে বসি তখন রাস্তায় দেখি চলাচলের চেহারা। ভালো করে যদি খোঁজ নিতে পারতুম তাহলে দেখতুম তার কোনো অংশই হালকা নয়,—ট্রাম হুহু ক'রে চলে গেল কিন্তু তার পিছনে মস্ত একটা ট্রাম কম্পানি,—সমুদ্রের এপারে ওপারে তার হিসেব চালাচালি। মানুষটা ছাতা বগলে নিয়ে চলেছে, মোটরগাড়ি তার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটিয়ে চলে গেল—তার সব কথাটা যদি চোখে পড়ত তাহলে দেখতুম বৃহৎ কাণ্ড—সুখে

দুঃখে বিজড়িত একটা বিপুল ইতিহাস। কিন্তু সমস্তই আমাদের চোখে হালকা হয়ে ঘটনাপ্রবাহ আকারে দেখা দিচ্ছে। অনেক মানুষ আছে যারা এই জানলার ধারে বসে যা দেখে তাতে একরকমের আনন্দ পায়। যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানলার ধারে বসে লেখে—আলাপ করে যায়—তার কোনো ভার নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে। এই সব চলতি ঘটনার পরে লেখকের বিশেষ অনুরাগ থাকা চাই, তাহলেই তার কথাগুলি পতঙ্গের মতো হালকা পাখা মেলে হাওয়ার উপর দিয়ে নেচে যায়। অত্যন্ত সহজ ব'লেই জিনিসটি সহজ নয়—ছাগলের পক্ষে একটুও সহজ নয় ফুলের থেকে মধু সংগ্রহ করা। ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস। সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া অল্প লোকের শক্তিতেই আছে। কথা বলবার বিষয় নেই অথচ কথা বলবার রস আছে এমন ক্ষমতা কজন লোকের দেখা যায়। জলের স্রোত কেবল আপন গতির সংঘাতেই ধ্বনি জাগিয়ে তোলে, তার সেই সংঘাতের উপকরণ অতি সামান্য, তার নুড়ি, বালি, তার তটের বাঁকচোর, কিন্তু আসল জিনিসটা হচ্ছে তার ধারার চাঞ্চল্য। তেমনি যে-মানুষের মধ্যে প্রাণস্রোতের বেগ আছে সে মানুষ হাসে আলাপ করে, সে তার প্রাণের সহজ কল্লোল,—চারিদিকের যে-কোনো কিছুতেই তার মনটা একটুমাত্র ঠেকে তাতেই তার ধ্বনি ওঠে। এই অতিমাত্র অর্থভারহীন ধ্বনিতে মন খুশি হয়—গাছের মর্মরধ্বনির মতো প্রাণ-আন্দোলনের এই সহজ কলরব।

যদি না মনে করো আমি অহংকার করছি তাহলে সত্য কথা বলি, অল্প বয়সে আমি চিঠি লিখতে পারতুম, যা-তা নিয়ে। মনের সেই হালকা চাল অনেকদিন থেকে চলে গেছে—এখন মনের ভিতর দিকে তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করে চলি। চিন্তা করতে করতে কথা কয়ে যাই—দাঁড় বেয়ে চলিনে, জাল ফেলে ধরি। উপরকার ঢেউএর সঙ্গে আমার কলমের গতির সামঞ্জস্য থাকে না। যাই হোক একে চিঠি বলে না। পৃথিবীতে চিঠি লেখায় যারা যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প। যে দুচারজনের কথা মনে পড়ে তারা মেয়ে। আমি চিঠিরচনায় নিজের কীর্তি প্রচার করব এ আশা করিনে।

নীলমণি দ্বিতীয়বার এসে বললে চা তৈরি। চা বিলম্ব সয় না—পোস্টআপিসের পেয়াদাও তথৈবচ। অতএব ইতি ৪ শ্রাবণ, ১৩৩৬।

৩৮

সকাল থেকেই আজ বাদলা। চারদিক ঝাপসা। ঘোর ঘনঘটা বললে যা বোঝায় তা নয়। মেঘদূত যেদিন লেখা হয়েছিল সেদিন পাহাড়ের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সেদিনকার নববর্ষায় আকাশে বাতাসে চলার কথাটাই ছিল বড়ো। দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছিল মেঘ, পুবে হাওয়া বয়েছিল "শ্যামজম্বুবনান্ত"কে দুলিয়ে দিয়ে, যক্ষনারী ব'লে উঠছিল, মাগো, পাহাড় সুদ্ধ উড়িয়ে নিলে বুঝি। তাই মেঘদূতে যে-বিরহ সে ঘরে বসে থাকার বিরহ নয়, সে উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ। তাই তাতে দুঃখের ভার নেই বললেই হয়; এমন কি তাতে মুক্তির আনন্দ আছে। প্রথম বর্ষা-ধারায় যে পৃথিবীকে, উচ্ছল ঝরনায়, উদ্বেল নদীস্রোতে, মুখরিত বনবীথিকায় সর্বত্র জাগিয়ে তুলেছে সেই পৃথিবীর বিপুল জাগরণের সুরে লয়ে যক্ষের বেদনা মন্দ্রাক্রান্তা ছন্দে নৃত্য করতে করতে চলেছে। মিলনের দিনে মনের সামনে এত বড়ো বিচিত্র পৃথিবীর ভূমিকা ছিল না—ছোটো তার বাসকক্ষ, নিভৃত—কিন্তু বিচ্ছেদ পেয়েছে ছাড়া নদীগিরি অরণ্য শ্রেণীর মধ্যে। মেঘদূতে তাই কান্না নেই, উল্লাস আছে। যাত্রা যখন শেষ হোলো, মন যখন কৈলাসে পৌঁছেছে, তখনি যেন সেখানকার নিশ্চল নিত্য ঐশ্বর্যের

মধ্যেই ব্যথার রূপ দেখা গেল—কেননা সেখানে কেবলি প্রতীক্ষা। এর মধ্যে একটা স্বতোবিরুদ্ধ তত্ত্ব দেখতে পাই। অপূর্ণ যাত্রা করে চলেছে পূর্ণের অভিমুখে—চলেছে ব'লেই তার বিচ্ছেদ নব নব পর্যায়ে গভীর একটা আনন্দ পায়—কিন্তু যে পরিপূর্ণ সে তো চলে না, সে চির যুগ প্রতীক্ষা করে থাকে—তার নিত্য পুষ্প, নিত্য দীপালোক, কিন্তু সে নিত্যই একা, সেই হচ্ছে যথার্থ বিরহী। সুর-বাঁধার মধ্যেও বীণায় সংগীতের উপলব্ধি পর্বে পর্বে শুরু হয়েছে, কিন্তু অগীত সংগীত অসীম অব্যক্তির মধ্যে অপেক্ষা করেই আছে। যে অভিসারিকা তারই জিৎ, কেননা আনন্দে সে কাঁটা মাড়িয়ে চলে। কিন্তু বৈষ্ণব এইখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলবে যাঁর জন্যে অভিসার তিনিও থেমে নেই, সমস্তক্ষণ বাঁশি বাজাচ্ছেন, প্রতীক্ষার বাঁশি—তাই অভিসারিণীর চলা আর বাঞ্ছিতের আহ্বান পদে পদেই মিলে যাচ্ছে—তাই নদী চলেছে যাত্রার সুরে, সমুদ্র দুলছে আহ্বানের ছন্দে—বিশ্বজোড়া বিচ্ছেদের আসর মিলনের গানে জমজমাট হয়ে উঠেছে,—অথচ পূর্ণ অপূর্ণের সে মিলন কোনো দিন বাস্তবের মধ্যে ঘটছে না, সে আছে ভাবের মধ্যে। বাস্তবের মধ্যে ঘটলে সৃষ্টি থাকত না—কেননা সৃষ্টির মর্মকথাই হচ্ছে চির অভিসার চির প্রতীক্ষার দ্বন্দ্ব। এভোলুশ্যন বলতে তাই বোঝায়। যাকগে, আমার বলবার কথা ছিল, বাদলার দিন মেঘদূতের দিন নয়—এ যে অচলতার দিন—মেঘ চলছে না, হাওয়া চলছে না, বৃষ্টি-যে চলছে তা মনে হয় না, ঘোমটার মতো দিনের মুখ

আবৃত করেছে। প্রহর চলছে না,বেলা কত হয়েছে বোঝা যায় না। সুবিধা এই যে চারদিকে বৃহৎ মাঠ, অবারিত আকাশ, প্রশস্ত অবকাশ। চঞ্চল কালের প্রবল রূপ দেখছিনে বটে কিন্তু অচঞ্চল দেশের বৃহৎ রূপ দেখা যাচ্ছে—শ্যামাকে দেখলুম না কিন্তু শিবের দর্শন মিলল। ইতি ৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৬।

৩৯

পুত্রসন্তান লাভ হোলে সে সংবাদ খুব উৎসাহ করে প্রচার করা হয়। গতকল্য আমার লেখনী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটককে জন্ম দিয়েছে—দশমাস তার গর্ভবাস হয়নি—বোধ করি দিন দশেকের বেশি সময় নেয়নি। "সর্বাঙ্গসুন্দর" বিশেষণটা প'ড়ে হয়তো তোমার ওষ্ঠাধর হাস্যকুটিল হয়ে উঠবে। ওর মধ্যে একটুখানি সাইকলজির খেলা আছে। বাক্যটা যখন মনের মধ্যে রচিত হয়েছিল তখন কথাটা ছিল "সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ", কিন্তু যখন লেখা হোলো তখন দেখি কথাটা বদলে গেছে। কেটে সংশোধন করা অসম্ভব ছিল না কিন্তু ভেবে দেখলুম যেটাকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করি সেইটেই লেখা হয়ে গেছে। বিনয়টাকে তখনি সদগুণ বলতে রাজি আছি যখন সেটা অসত্য নয়। তোমরা বলবে নিজের লেখা সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করা লেখকের পক্ষে সহজ নয়। সে কথা যদি বলো তাহলে কোনো লেখা সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে সত্যনির্ণয় কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। টেনিসনকে খুব ভালো বলেছিল একযুগে—অনতিপরবর্তী যুগে তাকে যথেষ্টপরিমাণ ভালো বলতে লোকে লজ্জিত হচ্ছে। আমি যেদিন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ প্রথম লিখেছিলেম সেদিন ওটা লিখে আনন্দে বিস্মিত হয়েছিলুম—আজ ওটাকে যদি কোনো নির্মলনলিনী দেবীর নামে চালিয়ে দিতে পারতুম কিছুমাত্র দুঃখিত হতুম না, এমন কি, অনেকখানিই আরাম পাওয়া যেত। এমন অবস্থায়, না

হয়, আজ যেটা ভালো লেগেছে আজই সেটাকে অসংকোচে ভাল বলাই গেল। এতো সত্যাগ্রহ নয়। নিজের লেখা খারাপ লাগতে যার বাধে না, এবং সেটাকে অকুণ্ঠিতভাষায় স্বীকার করতে যার বেদনা নেই, নিজের লেখার প্রশংসা করা তার পক্ষে অহংকার নয়। অতএব খুব জোরের সঙ্গেই বলব নাটকটা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। যারা শুনেছিল তাদের মধ্যে সকলেরই মত আমার সঙ্গে মিলেছিল, বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে * * * * ছিল না। তুমি হয়তো বলবে তোমাকে কলকাতায় গিয়ে এটা শোনাতে হবে। কিন্তু এতটা শোনার উত্তেজনা তোমার ডাক্তার কখনোই ভালো বলবেন না—বিশেষত শেষ পর্যন্ত এতে উত্তেজনার উপকরণ যথেষ্ট আছে। অতএব অপেক্ষা করো, জ্বরের মাত্রা কমুক জোরের মাত্রা বাড়ুক, তার পরে ঢের সময় আছে।

ঠিক এইখানটাতে খুব একটা ঘুমের বেগ এসে পড়ল মাথার মধ্যে—হঠাৎ প্রবল বর্ষণে যেমন চারদিক থেকে ঘোলা জলের ধারা নেমে আসে সেইরকমটা। বুদ্ধিটা একেবারেই স্বচ্ছ রইল না। অনেক সময়ে তৎসত্ত্বেও যে-কাজটা হাতে নেওয়া গেছে সেটা আমি জোর করে সেরে ফেলি—টলমল করতে করতেই লেখা চলে—ক'ষে মদ খেয়ে নাচতে গেলে যেরকমটা হয়। আমার অনেক লেখার মাঝে মাঝে এইরকম ঘুমের প্রবাহ বয়ে গেছে—সেই সব জায়গার হাতের অক্ষর দেখলে সেটা ধরা পড়ে। কিন্তু জাহাজ যেমন কুয়াষার

ভিতর দিয়েও গম্যস্থানের দিকে এগোয় আমার লেখাও তেমনি কল একেবারে বন্ধ করে না। যাকগে। বিষয়টা ছিল আমার নতুন নাটক রচনা। রাজা ও রানীর রূপান্তরীকরণ। সেই নাম রইল; সেই রূপ রইল না। বিশ্বভারতীর কর্মসচিবকে খাজনা দিতে হবে না। যদি সাবেক নামটার জন্যে ভাড়ার দাবি করেন সেটাকে বদলাতে কতক্ষণ। "সুমিত্রা" নামই ঠিক করেছি। প্রশান্ত মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যেন আমি নেড়াছন্দে ব্ল্যাঙ্কভার্সে নাটক লিখি। আমি স্পষ্টই দেখলুম গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো—তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের—কিন্তু গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়—অরণ্য পাহাড় মরুভূমি, সমতল, অসমতল, প্রান্তর কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি। জানা আছে পৃথিবীর জলময় রূপ আদিম যুগের—স্থলের আবির্ভাব হাল আমলের। সাহিত্যে পদ্যটাও প্রাচীন—গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে—তাকে ব্যবহার করা অধিকার করা সহজ নয়, সে তার আপন বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না—নিজের শক্তি প্রয়োগ ক'রে তার উপর দিয়ে চলতে হয়—ক্ষমতা অনুসারে সেই চলার বৈচিত্র্য কত তার ঠিক নেই, ধীরে চলা, ছুটে চলা, লাফিয়ে চলা, নেচে চলা, মার্চ করে চলা—তার পরে না-চলারও কত আকার—কত রকমের শোওয়া বসা দাঁড়ানো। বস্তুত গদ্যরচনায় আত্মশক্তির সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবিকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের

গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্যরচনায় সুরসংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ। মনে রাখা দরকার ভাষা এখন সাবালক হয়েছে, ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াতে তার লজ্জা হবার কথা। ছন্দ বলতে বোঝাবে বাঁধা ছন্দ। ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩৬।

৪০

আজ স্রুরুলে হলচালন উৎসব হবে। লাঙল ধরতে হবে আমাকে। বৈদিক মন্ত্রযোগে কাজটা করতে হবে ব'লে এর অসম্মানের অনেকটা হ্রাস হবে। বহু হাজার বৎসর পূর্বে এমন একদিন ছিল যখন হাললাঙল কাঁধে ক'রে মানুষ মাটিকে জয় করতে বেরিয়েছিল, তখন হলধরকে দেবতা ব'লে দেখেছে, তার নাম দিয়েছে বলরাম। এর থেকে বুঝবে নিজের যন্ত্রধারী স্বরূপকে মানুষ কতখানি সম্মান করেছে, বিষ্ণুকে বলেছে চক্রধারী, কেননা এই চক্র হচ্ছে বস্তুজগতে মানুষের বিজয়রথের বাহন। মাটি থেকে মানুষ ফসল আদায় করেছে এটা তার বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে হাল লাঙলের উদ্ভাবন। এমন জন্তু আছে যে আপনার দাঁত দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ ক'রে খাদ্য উদ্ধার করে, মানুষের গৌরব হচ্ছে সে আপন দেহের উপর চূড়ান্ত নির্ভর করে না, তার নির্ভর যন্ত্র উদ্ভাবনী বুদ্ধির উপর। এরই সাহায্যে শারীর ক্রমে একজন মানুষ হয়েছে বহু মানুষ। গৌরবে বহুবচন। আজ আমরা একটা মিথ্যে কথা প্রায় ব'লে থাকি dignity of labour অর্থাৎ শারীর শ্রমের সম্মান। অন্তরে অন্তরে মানুষ এটাকে আত্মাবমাননা ব'লেই জানে। আজ আমাদের উৎসবে আমরা হাল লাঙলের অভিবাদন যদি করে থাকি তবে সেটা আপন উদ্ভাবন কৌশলের আদিম প্রকাশ ব'লে। সেই-

খানে খতম করতে বলা মনুষ্যত্বকে অপমানিত করা। চরকাকে যদি চরম আশ্রয় বলি তাহলে চরকাই তার প্রতিবাদ করবে —আপন দেহশক্তির সহজ সীমাকে মানুষ মানে না এই কথাটা নিয়ে চরকা পৃথিবীতে এসেছে—সেই চরকার দোহাই দিয়েই কি মানুষের বুদ্ধিকে বেড়ার মধ্যে আটকাতে হবে। আজ দেখলুম একটা বাংলা কাগজ এই ব'লে আক্ষেপ করছে যে, বেহারের ইংরেজ মহাজন কলের লাঙলের সাহায্যে চাষ শুরু করেছে তাতে ক'রে আমাদের চাষীদের সর্বনাশ হবে। লেখকের মত এই-যে আমাদের চাষীদের আধপেটা খাওয়াবার জন্যে মানুষের বুদ্ধিশক্তিকে অনন্তকাল নিষ্ক্রিয় ক'রে রেখে দিতে হবে। লেখক এ কথা ভুলে গেছেন-যে চাষীরা বস্তুত মরছে নিজের জড়বুদ্ধির ও নিরুদ্যমের আক্রমণে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যাপারে আমি আর-আর অনেক প্রকারের আয়োজন করেছি—কিন্তু যে-শিক্ষার সাহায্যে মানুষ একান্ত দৈহিক শ্রমপরতার অসম্মান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে তার আয়োজন করতে পারলুম না এই দুঃখ অনেক দিন থেকে আমাকে বাজছে। দেহের সীমা থেকে যে-বিজ্ঞান আমাদের মুক্তি দিচ্ছে আজ য়ুরোপীয় সভ্যতা তাকে বহন ক'রে এনেছে—একে নাম দেওয়া যাক বলরামদেবের সভ্যতা। তুমি জানো বলরামদেবের একটু মদ খাবারও অভ্যাস আছে, এই সভ্যতাতেও শক্তিমত্ততা নেই তা বলতে পারিনে, কিন্তু সেই ভয়ে শক্তিহীনতাকেই শ্রেয় গণ্য করতে হবে এমন মূঢ়তা আমাদের না হোক। শান্তিনিকেতনকে

কেউ কেউ মনে করে পৌরাণিক যুগের জিনিস, তপোবনের বল্কলে আগাগোড়া ঢাকা। হায় রে তুরদৃষ্ট, শান্তিনিকেতন যে কী সেটা কিছুতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না। যারা প্রাচীন-পন্থী তারা আমাদের ললাটে সনাতনের ছাপ না দেখে চটে যায়, যারা তরুণ, আমাদের মধ্যে পুরাতনের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধা হারায়, কেউ আমাদের আমল দেয় না, কিছুই ক'রে উঠতে পারলুম না, টানাটানি ঘোচে না, মাথার পাগড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে পায়ের জুতোটা পর্যন্ত কোনোটা আঁট, কোনোটা ছেঁড়া, কোনোটা একেবারেই ফাঁক। কিছু যে করেছি দেশের লোক এ কথা মানে না, কিছু-যে করতে পারি আমার উপর এ ভরসাও রাখে না, অবশেষে এমন কথাও শুনতে হোলো যে আমার কবিতায় ছন্দোভঙ্গ হয়। এতদিন মনে এই আশা ছিল-যে, আর কিছুই না পারি অন্তত ছন্দ মেলাতে পারি এইটুকু বিশ্বাস আমার পরে দেশের লোকের আছে। যাবার বেলায় সেটুকুও ভাসিয়ে দিতে হোলো। "আমার জন্মভূমি" আমাকে গ্রহণ করেছেন নগ্নদেহে, বিদায় দেবেন নগ্ন সম্মানে। ইতি ২৫ শ্রাবণ, ১৩৩৬।

৪১

সেদিন একটা কোনো বাংলা কাগজে বঙ্কিমের গল্পের কথা পড়ছিলুম। দেখলুম লেখক প্রশংসা করেছেন বটে কিন্তু বেশ একটু জোর করে সুর চড়াতে হচ্ছে পাছে অন্যমনস্ক পাঠকের কানে গিয়ে না পৌঁছয়। মনে পড়ল যখন বঙ্গদর্শন প্রথম দেখা দিয়েছে, বিষবৃক্ষ মাসে মাসে খণ্ডশঃ বের হচ্ছে, ঘরে ঘরে দেশের মেয়েপুরুষ সকলের মধ্যে কী ঔৎসুক্য, রস-ভোগের কী নিবিড় আনন্দ। মনে করা সেদিন অসম্ভব ছিল যে এই আনন্দের বেগ কোনোদিন এতটা ক্ষয় হোতে পারে যাতে এর উৎকর্ষ প্রমাণ করতে জোর গলায় ওকালতির দরকার হবে। কিন্তু দেখতে দেখতে সেদিনও এল। এমন কি অপ্রকাশ্যে বঙ্কিমের যশ আজকাল অনেকেই হরণ করে থাকেন। আমি ছাড়া আমাদের দেশের আর কোনো খ্যাত লেখকের সম্বন্ধে প্রকাশ্যে এমন কাজ করতে কেউ সাহস করে না। মনে মনে ভাবলুম, ভালোমন্দ লাগার আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ শক্তির দ্বারা মানুষের ইতিহাসে যে মানস-সৃষ্টির উদ্যম চলেছে, সে মায়ার সৃষ্টি। বঙ্কিমকে যেদিন খুব ভালো লাগছিল সেদিন পাঠকসমাজে কতকগুলি মানস-উপাদান কিছু বা বেশি ছিল, কিছু ছিল না বা কম ছিল, সেগুলি বিশেষ আকারে বিশেষ পরিমাণে সম্মিলিত ও সজ্জিত ছিল এই কারণ বশতই তার সম্ভোগসুখরূপ ফলটা এত অত্যন্ত প্রবল হোতে পেরেছে।

ইতিমধ্যেই, ২০।২৫ বছর না যেতে যেতেই, প্রবহমান কালের ধাক্কায় তারা নড়ে চড়ে গেছে ; সামনের জিনিস পিছনে পড়ল, উপরের জিনিস নিচে পড়ল অমনি সেদিনকার অত দীপ্তিমান অত বেগবান উপলব্ধিও আজ অবাস্তব হয়ে দাঁড়াল, অন্তত অনেক লোকের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য হয়েছে সেদিনকার ভালোলাগা কী করে সম্ভবপর হোলো। আজকের পাঠক সগর্বস্মিত হাস্যে ভাবছে সেদিনকার পাঠকদের মন ছিল নেহাত কাঁচা, এইজন্যেই সেই কাঁচা ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-বিচার স্থায়ী হোতে পারে না। নিজের মনের একান্ত উপলব্ধির মতো বাস্তব আমাদের কাছে আর কিছুই নেই। চোখে যেটাকে যা দেখছি সেটা যে তাই না হোতেও পারে এমন সন্দেহকে মনে স্থান দিলে বোধশক্তি সম্বন্ধে নাস্তিকতায় পৌঁছতে হয়—এতে কাজ চলে না। ভাগ্যক্রমে আমাদের দৈহিক চোখের বদল হয় না অথবা বহুলক্ষ বৎসরে হয়ে থাকে —তাই আমাদের আজকের দেখার সঙ্গে কালকের দেখার গুরুতর বিরোধ নেই, এই কারণে আমাদের দৃশ্যলোক ব'লে যে একটা সৃষ্টি আছে সেটাকে অন্তত সাধারণ লোকে মায়া বলতে পারে না। কিন্তু আমাদের দৈহিক চোখের স্নায়ু পেশি এবং তার উপকরণ যদি কেবলি নড়াচড়া করত তাহলে এই দেখার জগৎ আকাশের মেঘের মতো রূপান্তর ধরতে ধরতেই চলত। কিন্তু কালে কালে আমাদের মনের দৃষ্টির বদল চলছেই, আজ সেই দৃষ্টির যে সব উপকরণের যোগে একটা বিশেষ অনুভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে, এবং এত স্পষ্ট

হয়েছে ব'লেই এত নিত্যরূপে সে প্রতীত, কাল তাদের আগাগোড়া বদল হয় না বটে কিন্তু অনেকখানি এদিক-ওদিক হয়ে যায়, তখন বোঝা যায় না বিষবৃক্ষকে এত বেশি ভালো লেগেছিল কী ক'রে। একেই বলতে হয় মায়া। এই মায়ার উপরে দাঁড়িয়ে কত গালমন্দ তর্কবিতর্ক রক্তপাত। অথচ মানুষের মনের প্রকৃতিতে মোটামুটি অনেকখানি নিত্যতার বন্ধন যে নেই তা বলতে পারিনে, না থাকলে মানবসমাজ হোত প্রকাণ্ড একটা পাগলা গারদ। বস্তুজগতের মূলভূতের উপাদানসংস্থানে মোটের উপর একটা বন্ধন আছে সেইজন্তেই কার্বনটা কার্বন অক্সিজেনটা অক্সিজেন। কিন্তু বহুদীর্ঘ-কালের ভূমিকায় আদি সূর্য থেকে বর্তমান পৃথিবী পর্যন্ত সৃষ্টিসংঘটনের যে ব্যাপার চলছে, তাতে সেইসব মূলভূতের মধ্যেও টানা-ছেঁড়া ঘটেছে, সেটা ভেবে দেখতে গেলে দেখি সৃষ্টিটা অনাদিকালের ক্ষেত্রে অনন্ত মরীচিকার প্রবাহ। এত-দিন বিজ্ঞান ব'লে আসছিল সেই পরিবর্তনের মধ্যে একটা বাঁধা নিয়মের সুদৃঢ় ধ্রুবসূত্র আছে। আজ বলছে সে-কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, থেকে থেকে অঘটন ঘটে, তুই-তুইয়ে পাঁচও হয় নিত্য এবং আকস্মিকের দ্বন্দ্ব সমাসে। বস্তুজগতের তত্ত্বালোচনা আমার কলমে শোভা পায় না, বলছিলুম ভাব-জগতের কথা, বিশেষভাবে সাহিত্যকে নিয়ে। এই জগতে নিন্দা প্রশংসার নিত্যতার কথা কে বলতে পারে। সমা-লোচকেরা দৈবজ্ঞের সাজ পরে গণনা করে কুষ্টি তৈরি করছেন —তখনকার মতো সে কুষ্টি দাম দিয়ে কিনে লোকে মাথায়

করে নিচ্ছে—কিন্তু হায়রে শেষকালে আয়ুর কোঠায় মিল পায় না, গুণাগুণ ফলাফলও তথৈবচ। তবুও মানবপ্রকৃতি একেবারে উন্মাদ নয়, মোটামুটি তার মধ্যে একটা হিসাবের ধারা পাওয়া যায়, যদিচ সে হিসাব সম্বন্ধে গণনার ভুল প্রতিদিন ঘটে। গতকল্যের গণনার ভুল আজকে দেখে যাঁরা খুব উচ্চকণ্ঠে হাসছেন আবার তাঁরাই দেখি খুব দম্ভসহকারে ছক কেটে গণনায় বসে গেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁদের গণনা অপ্রমাণ হয় ভাবীকালে, আশু তাঁরা নগদ বিদায় পান, লোকে যেটা শুনতে চায় সেইটেকে খুব বিজ্ঞের মতো বিছে ফলিয়ে বলবার শক্তি আছে তাঁদের, নিজের ও অন্যের ঈর্ষাবিদ্বেষকে তাঁরা উপস্থিত মতো খোরাক জুগিয়ে তাদের পালোয়ান ক'রে তোলেন, অবশেষে দুদিন বাদে তাঁদের কথা কারো মনেও থাকে না, সুতরাং তখন তাঁদের মিথ্যে ধরা পড়লেও জবাবদিহি করবার জন্য কোনো আসামীকে হাজির পাওয়া যায় না।—সন্দেহ হচ্ছে মনের মধ্যে অনেকদিনের অনেক ঝগড়া জমা হয়ে রয়েছে তোমার পত্রযোগে সেগুলোকে নিরাপদে ব্যক্ত করতে বসেছি। কিন্তু কিসেরই বা আক্ষেপ। খ্যাতি জিনিসটার পনরো আনাই মৃত্যুর পরবর্তী ভাবীকালের সম্পদ, সে সম্পদ খাঁটি কি মেকি তাতে কার কী আসে যায়, যিনি প্রশংসা পেতে চান তিনিও পান এমন কিছু যা কিছুই নয়, আর যিনি গাল দিয়ে খুশি হোতে চান তাঁরও সে খুশি শূন্যের উপর। মায়া! "অতএব বলি শুন ত্যজ দম্ভ তমোগুণ।" অতএব যা চারদিকে

রয়েছে তাকে সহজ মনে গ্রহণ করে হও খুশি।—অতএব যদিচ আজ ভাদ্রমাসের মধ্যাহ্নের অসহ্য গরম তবু সর্বত্রই শরৎকালের মাধুর্য অজস্র, এইটাই যদি পরিপূর্ণ মনে ভোগ করে নিতে পারি তবে সেটাকে ফাঁকি বলতে পারব না—যদিও এর পরবর্তী ফাল্গুনমাসের সৌন্দর্য অন্যজাতের তবুও সেই বসন্তের দোহাই পেড়ে এই শরতের দানে খুঁত ধরে তার থেকে বৃথা নিজেকে বঞ্চিত করা কেন। ইতি ১৮ ভাদ্র, ১৩৩৬।

৪২

ফুল ফোটে গাছের ডালে, সেই তার আশ্রয়। কিন্তু মানুষ তাকে আপনার মনে স্থান দেয় নাম দিয়ে। আমাদের দেশে অনেক ফুল আছে যারা গাছে ফোটে, মানুষ তাদের মনের মধ্যে স্বীকার করেনি। ফুলের প্রতি এমন উপেক্ষা আর কোনো দেশেই দেখা যায় না। হয়তো বা নাম আছে কিন্তু সে নাম অখ্যাত। গুটিকয়েক ফুল নামজাদা হয়েছে কেবল গন্ধের জোরে—অর্থাৎ উদাসীন তাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করলেও তারা এগিয়ে এসে গন্ধের দ্বারা স্বয়ং জানান দেয়। আমাদের সাহিত্যে তাদেরই বাঁধা নিমন্ত্রণ। তাদেরও অনেকগুলির নামই জানি, পরিচয় নেই, পরিচয়ের চেষ্টাও নেই। কাব্যের নামমালায় রোজই বারবার প'ড়ে আসছি যূথী জাতি সেঁউতি। ছন্দ মিললেই খুশি থাকি, কিন্তু কোন্ ফুল জাতি, কোন্ ফুল সেঁউতি সে-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারও উৎসাহ নেই। জাতি বলে চামেলিকে, অনেক চেষ্টায় এই খবর পেয়েছি, কিন্তু সেঁউতি কাকে বলে আজ পর্যন্ত অনেক প্রশ্ন ক'রে উত্তর পাইনি। শান্তিনিকেতনে একটি গাছ আছে তাকে কেউ কেউ পিয়াল বলে—কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে বিখ্যাত পিয়ালের পরিচয় কয়জনেরই বা আছে। অপরপক্ষে দেখো, নদীর সম্বন্ধে আমাদের মনে ঔদাস্য নেই, নিতান্ত ছোটো নদীও আমাদের

মনে প্রিয়নামের আসন পেয়েছে, কপোতাক্ষী, ময়ূরাক্ষী, ইচ্ছামতী—তাদের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের সম্বন্ধ। পূজার ফুল ছাড়া আর কোনো ফুলের সঙ্গে আমাদের অবশ্য প্রয়োজনের সম্বন্ধ নেই। ফ্যাশানের সম্বন্ধ আছে অচিরায়ু সীজ্‌ন্ ফ্লাউয়ারের সঙ্গে—মালীর হাতে তাদের শুশ্রূষার ভার—ফুলদানিতে যথারীতি তাদের গতায়াত। একেই বলে তামসিকতা, অর্থাৎ মেটীরিয়ালিজ্‌ম্—স্থূল প্রয়োজনের বাইরে চিত্তের অসাড়তা। এই নামহীন ফুলের দেশে কবির কী দুর্দশা ভেবে দেখো, ফুলের রাজ্যে নিতান্ত সংকীর্ণ তার লেখনীর সঞ্চরণ। পাখি সম্বন্ধেও ঐ কথা, কাক কোকিল পাপিয়া বৌ-কথা-কওকে অস্বীকার করবার উপায় নেই— কিন্তু কত সুন্দর পাখি আছে যার নাম অন্তত সাধারণে জানে না। ঐ প্রকৃতিগত ঔদাসীন্য আমাদের সকল পরাভবের মূলে—দেশের লোকের সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্যও এই স্বভাববশতই প্রবল। পরীক্ষা পাসের জন্যে ইতিহাস পাঠে উপেক্ষা করবার জো নেই—আমাদের স্বাদেশিকতা সেই পুঁথির ঝুলি দিয়ে তৈরি, দেশের লোকের পরে অনুরাগের ঔৎসুক্য দিয়ে নয়। আমাদের জগৎটা কত ছোটো ভেবে দেখো—তার থেকে কত জিনিসই বাদ পড়েছে। ইতি ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯।

৪৩

আমার জীবনে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হয়েছে। সে-সাধনা হচ্ছে আবরণ মোচনের সাধনা, নিজেকে দূরে রাখবার সাধনা। আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা। স্থির হয়ে বসে এ-কথা প্রায়ই আমাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতে হয়, যে, যে-আমি প্রতিদিনের সুখ দুঃখে কর্মে চিন্তায় বিজড়িত, সে ঐ সংখ্যাহীন অনাত্মের নিরুদ্দেশ স্রোতে ভেসে যাওয়ার সামিল। তাকে দ্রষ্টারূপে স্বতন্ত্রভাবে দেখতে পারলেই ঠিক দেখা হয়—তার সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছিন্ন এক ক'রে জানাই মিথ্যা জানা। আমার পক্ষে এই উপলব্ধির অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন আছে ব'লেই আমি একে এত ক'রে ইচ্ছা করি। আমার মনের বাসা চৌমাথায়, আমার সব দরজাই খোলা, সব রকমের হাওয়া এসেই পৌঁছয়, সব জাতেরই আগন্তুক একেবারে অন্দরে ঢুকে পড়ে। মানুষের জীবনে অন্দর ব'লে একটা জায়গা আছে, সেইটে তার বেদনার জায়গা, সেইখানে তার অনুভূতি। এইজন্যেই এর মধ্যে কেবল অন্তরঙ্গের প্রবেশ। তাদেরই নিয়ে সুখদুঃখের লীলাই সংসারের লীলা। ঐ সীমার মধ্যে সবই সহ্য করতে হয়। কিন্তু আমার জীবনদেবতা আমাকে কবি করবেন স্থির করেছেন ব'লেই আমার অন্দরমহলকে অরক্ষিত রেখেছেন, আমার খিড়কির দরজা নেই, চারিদিকেই

সদর দরজা। সেইজন্যেই আমার অন্দরমহলে কেবল আহূত নয়, রবাহূত অনাহূতের আসা যাওয়া। আমার বেদনা যন্ত্রে সকল সপ্তকের সকল সুর বাজবার মতোই তার চড়িয়ে রাখা হয়েছে। সুর থামালে আমার নিজের কাজ চলে না। সংসারকে বেদনার অভিজ্ঞতাতেই আমাকে জানতে হবে—নইলে প্রকাশ করব কী। আমার তো বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের মতো জ্ঞানের ব্যাখ্যা নয়, আমার-যে প্রাণের প্রকাশ। কিন্তু একদিকে এই অনুভূতিতেই যেমন প্রকাশের প্রবর্তনা তেমনি আর একদিকে তাকে ছাড়িয়ে দূরে আসাও রচনার পক্ষে দরকার। কেননা দূরে না এলে সমগ্রকে দেখা যায় না, সুতরাং দেখানো যায় না। সংসারের সঙ্গে অত্যন্ত এক হয়ে গেলেই অন্ধতা জন্মায়, যাকে দেখতে হবে সেই জিনিসটাই দেখাকে অবরুদ্ধ করে। তা ছাড়া ছোটো হয়ে ওঠে বড়ো, এবং বড়ো হয়ে যায় লুপ্ত। সংসারে বড়োর সুবিধে এই যে, সে আপনার ভার আপনি বহন করে, কিন্তু ছোটোগুলো হয়ে ওঠে বোঝা। তারাই সব চেয়ে অনর্থক অথচ সব চেয়ে বেশি চাপ দেয়। তার প্রধান কারণ তাদের ভার অসত্যের ভার। দুঃস্বপ্ন যখন বুকের উপর চেপে বসে, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, তবুও সেটা মায়া। যখন আমি-র গণ্ডী দিয়ে জীবনের পরিমণ্ডলটাকে ছোটো করি তখনি সেই ছোটো-র রাজ্যে ছোটোই বড়োর মুখোষ প'রে মনকে উদ্বেজিত করে। যা সত্যই বড়ো, অর্থাৎ যা আমি-র পরিধি ছাপিয়ে যায়, তার সামনে যদি এদের ধরা যায় তাহলে তখনি এদের মিথ্যে আতিশয্য ঘুচে গিয়ে এরা

এতটুকু হয়ে যায়। তখন, যা কাঁদায়, তাকে দেখে হাসি পায়। এই কারণেই আমি-র বড়োটাকে আমার থেকে সরানোই জীবনের সব চেয়ে বড়ো সাধনা, তাহলেই আমাদের অস্তিত্বের সব চেয়ে বড়ো অপমানটাই লুপ্ত হয়। অস্তিত্বের অপমানটা হচ্ছে ছোটো খাঁচায় থাকা, সেটা পশুপাখিকেই শোভা পায়। এই আমি-র খাঁচার মধ্যে সব মারই হয় বেঁধে মার, সব বোঝাই হয়ে ওঠে অচল বোঝা। এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অন্তত এক পংক্তি দূরে সরিয়ে বসিয়ে রাখাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অত্যন্ত দরকার, নইলে নিজের দ্বারা নিজেকে পদে পদে লাঞ্ছিত হোতে হয়। মৃত্যুশোকের দ্বারা বৈরাগ্য আনে, সেই রকম বৈরাগ্যের মুক্তি একাধিকবার অনুভব করেছি, কিন্তু যথার্থ বৈরাগ্য আনে যা কিছু সত্য বড়ো তাকেই সত্য ক'রে উপলব্ধি করার দ্বারায়। আমার নিজের মধ্যেই বড়ো আছে, যে দ্রষ্টা, আমার নিজের মধ্যে ছোটো হচ্ছে, যে ভোক্তা। ঐ দুটোকে এক ক'রে ফেললে দৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ দুষ্ট হয়। কাজ জিনিসটাকে বাইরে থেকে ঠেলাগাড়ির মতো ঠেলতে থাকলেই সেটা চলে ভালো, কিন্তু ঠেলাগাড়িটাকে যদি কাঁধে নিয়ে চলি তবে গলদ্‌ঘর্ম ব্যাপার হয়ে ওঠে। বিশ্বভারতী ব'লে একটা কাজ নিয়েছি, এ কাজটা সহজ হয় যদি একে আমি-র ঘাড়ে না চাপাই, যদি আমি-র থেকে বিযুক্ত ক'রে রাখি। অবস্থাগতিকে কাজ সফলও হয় বিফলও হয় কিন্তু সেটা যদি আমি-কে স্পর্শ না করে তাহলেই সেই আমি-নির্মুক্ত কাজ নিজেরও মুক্তি

আনে, আমারও মুক্তি আনে। সব চেয়ে যিনি বড়ো তাঁরই কাছে আমাদের সব চেয়ে বড়ো প্রার্থনা এই—অসতো মা সদ্‌গময়। কেমন ক'রে এ প্রার্থনা সার্থক হবে। না, আমার মধ্যে তাঁর আবির্ভাব যদি পূর্ণ হয়। তাঁকে যদি আমার মধ্যে সত্য করে দেখি তবেই আমি-র উপদ্রব শান্ত হোতে পারে।

জানি না আমার এ চিঠি কবে পাবে। যদি জন্মদিনে পাও তো খুশি হব। যদি না-ও পাও তবে জন্মদিনকে আরো একটি দিন পর্যন্ত বাড়িয়ে নিলে বিশেষ ক্ষতি হবে না। যে সব কথা নিজের অন্তরতম তা সব সময়ে বলতে পারা যায় না, অথচ বলা চাই নিজেরই জন্যে। তাই তোমার জন্মদিনকে উপলক্ষ্য ক'রে এই চিঠি লিখলুম, কেননা প্রত্যেক জন্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে মুক্তির মন্ত্র, অন্ধকার থেকে জ্যোতির মধ্যে মুক্তি। ইতি ৬ কার্তিক, ১৩৩৬।

৪৪

প্রশান্ত তার চিঠিতে লিখেছে বুলার পেন্সিল দিয়ে যে-লেখাগুলো বেরোয় বিশেষ ক'রে তার পরীক্ষা আবশ্যক। আমার নিজের মনে হয় এ সব ব্যাপারে অতি নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। আমার আপন সম্বন্ধে যাকে ফ্যাক্ট্‌স্ বলা যায় তাই নিয়ে যদি তুমি পরীক্ষা করো তবে প্রমাণ হবে আমি রবীন্দ্রনাথ নই। যে-গান নিজে রচনা করেছি পরীক্ষা দিতে গেলে তার কথাও মনে পড়বে না তার সুরও নয়। একজন জিজ্ঞাসা করেছিল চন্দননগরের বাগানে যখন ছিলুম তখন আমার বয়স কত, আমাকে বলতে হয়েছিল, আমি জানিনে, বলা উচিত ছিল, প্রশান্ত জানে। আমি যখন দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিলুম, সে দুবছর হোলো, না তিন বছর, না চার বছর নিঃসংশয়ে বলতে পারিনে। আমার মেজো মেয়ের মৃত্যু হয়েছিল কবে, মনে নেই—বেলার বিয়ে হয়েছিল কোন্ বছরে কে জানে। অথচ টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা কবার সময়ে তুমি যা নিয়ে আমার সম্বন্ধে নিঃসংশয় সেটা তোমার ধারণা মাত্র। তুমি জোর করে বলছ ঠিক আমার স্বর, আমার ভাষা, আমার ভঙ্গী, আর কেউ যদি বলে, না, তার পরে আর কথা নেই। কেননা তোমার মনে আমার ব্যক্তিত্বের যে একটা মোট ছবি আছে, অন্যের মনে

তা না থাকতে পারে কিংবা অন্যরকম থাকতে পারে। অথচ এই ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্যই সব চেয়ে সত্য সাক্ষ্য, কেননা এটাকে কেউ বানাতে পারে না। আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ তথ্য আমার চেয়ে প্রশান্ত বেশি জানে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও আমার মোট ছবিটা সে নিজের মধ্যে ফোটাতে পারবে না। আত্মার চরম সত্য তথ্যে নয়, আত্মার আত্মকীয়তায়।

ইতিমধ্যে পর্শু বুলার হাতে একটা লেখা বেরিয়েছে তাতে নাম বেরোল না। বললে, নাম জিজ্ঞাসা কোরো না, তুমি মনে যা ভাবছ আমি তাই। তার পরে যেসব কথা বেরোল সে ভারি আশ্চর্য। তার সত্যতা আমি যেমন জানি আর দ্বিতীয় কেউ না। কোনো এক অবসরের সময় কপি করে তোমাকে পাঠাব। কিন্তু অবসর আর পাব কিনা জানিনে। অনেক কাজ। প্রশান্ত এখনো ওখানে আছে কিনা জানিনে। তাকে এই চিঠি দেখিয়ো। ইতি ১০ নবেম্বর, ১৯২৯।

৪৫

আমার কেমন মনে হয় আমি আবার যেন পৃথিবীর খুব কাছে এসেছি। যেমন কাছে ছিলুম ছেলেবেলায়। মন তখন আপন চিন্তায় জগৎ তৈরি করতে এত ব্যস্ত ছিল না—সেই জন্যে বাইরের সঙ্গে আমার যোগ অত্যন্ত সহজ ছিল। সেই সময় আমার অনুভব করবার শক্তি ছিল সজীব। তাই আমি ছিলুম আমার চারিদিকে—ঘরের লোকের যেমন ঘরের কোনো জায়গায় যাবার বাধা থাকে না, এই বাইরের পৃথিবীতে আমার যেন সেই রকম অধিকার ছিল। আমার কাছে ভাবের দাবি এবং চিন্তার দাবি দুইই খুব প্রবল। আমি ভালো করে চেয়ে দেখায় সুখ পাই, ভালো ক'রে ভেবে না দেখেও থাকতে পারিনে। যেমন আমার চেয়ে-দেখাকে কাজে লাগিয়েছি সাহিত্যে, তেঁমনি আমার ভেবে-দেখাকেও কাজে লাগিয়েছি নানা প্রতিষ্ঠানে। এমনি ক'রে অনেকদিন চলে আসছিল। কিন্তু চিন্তার শাসনটাই উঠছিল সব চেয়ে জবরদস্ত হয়ে—অন্তরে বাহিরে তার কর্মের তাগিদ নানা শাখাপ্রশাখায় আমার সমস্ত অবকাশ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল। জগতে সবাই অবকাশের অধিকার নিয়ে আসে না—অনেকের পক্ষেই অবকাশটা শূন্যতা—আমি কিন্তু শিশুকাল থেকেই বিধাতার

কাছ থেকে আমার সব চেয়ে বড়ো দান পেয়েছি এই অবকাশের দান। আর একবার এখান থেকে বিদায় নেবার আগে অবকাশের পশ্চিম দিগন্তে রঙের খেলা খেলিয়ে তার পরে অস্ত সমুদ্রে ডুব দিতে ইচ্ছে করে। খ্যাতির বোঝা ঘাড়ে চেপেছে সেটাকে শেষ পর্যন্ত নামাতে পারব না—তবু যতটা পারি আমার অভিমানটাকে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে তাতে আলপনা কেটে যাব এই ইচ্ছেটা প্রতিদিন দরজায় ধাক্কা মেরে যাচ্ছে—শীতের মধ্যাহ্নে নীলাভ সুদূরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি।

তুমি কেমন আছ তার খাপছাড়া খবর পাই। কোথায় কী ভাবে আছ তার ছবিটা আন্দাজ করা শক্ত। ইতি ২০ ভাদ্র।

৪৬

তোমাকে চিঠি লিখব লিখব করছি এমন সময় তোমার চিঠি পেলুম। বিশেষ ক'রে লেখবার বিষয় কিছু আছে তা নয়—কিন্তু যা লিখলেও হয়, না লিখলেও হয় কিছুতেই আসে যায় না সেটা হচ্ছে উড়ো ভাবনা, তাকে ধরা শক্ত। যাকে বলে খবর সে—

এই পর্যন্ত লিখেছি তার পরে অনেকদিন হোলো, সময় চাপা পড়ে গেল নানা আকার আয়তনের নানাপ্রকার কাজের তলায়। সেদিনকার উড়ো ভাবনা সেইদিনেই লীলা সাঙ্গ ক'রে বৈতরণী পেরিয়ে চলে গেছে। সেদিন ছিল শীতের দুপুরবেলাটা আমার জগতে সব চেয়ে বড়ো স্থান নিয়ে—পেয়ালা উপচিয়ে পড়ছিল—আমার মনটা যেন সমস্ত আকাশ জুড়ে ছিল, আর তার মধ্যে জমে উঠেছিল সোনার আলোর নেশা—এই মন, আকাশ আলো আর খোলা মাঠ নিয়ে সবসুদ্ধ ব্যাপারখানা যে কী তা তো স্পষ্ট ক'রে বলবার জো ছিল না। অস্পষ্ট ক'রেই বলতে বসেছিলুম এমন সময় কোনো একটা সুস্পষ্ট কর্তব্য কিংবা অকর্তব্য মনটাকে নিয়ে গেল সেই কলমের মুখ থেকে ছিনিয়ে। ঠিক সেই জায়গাটাতে ফিরে আসা আর ঘটল না। যেটাকে "সেই জায়গা" বলছি "সেই জায়গাটা" সুদ্ধ দৌড় মেরেছে।

সেদিন আমার এক বন্ধু এসেছিলেন যারা

আমার কুৎসা করছে তাদের সঙ্গে তাঁর যোগ নেই এই কথাটা জানিয়ে যেতে। অথচ আমার তরফেও কিছু কিছু ত্রুটি আছে এই আভাসও তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। আমার সহচরদের বাক্যে বা ব্যবহারে যত কিছু মূঢ়তা প্রকাশ পায়, আমার জীবনচরিতের অধ্যায়ে লোকে সেগুলো যোজনা ক'রে আমার নামের উপর কালিমা লেপন করে। যেমন ঝড়ের উপর মারীর উপর মানুষ রাগ করে না, তেমনি এই সমস্ত আঘাতকে স্বীকার ক'রে নিয়ে আমি যেন রাগ না করি, যেন শান্ত থাকি প্রতিদিনই নিজেকে এই কথাই বলছি এবং মনের ভিতর থেকে এর সায় পাচ্ছি। আজ সাতই পৌষ। সকালবেলাকার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। ভিতরকার গভীর কথাকে প্রকাশ করার দ্বারা যে একটা শান্তি আসে আজ সেই শান্তি আমার মনের উপর বিরাজ করছে। ইতি ৭ই পৌষ, ১৩৩৬।

৪৭

শরীর অলস, মনটা মন্থর। শক্তির গোধূলি। কেদারায় বসে আছি তো বসেই আছি, একটুখানি উঠে টেবিলে বসে সামান্য কিছু একটা কাজ করব তাও কেবলি পিছিয়ে যাচ্ছে। রাত হয়ে যায়, বিছানায় শুতে যাব, তাতে গড়িমসি, সকাল হোলো রোদ উঠেছে, বিছানা ছেড়ে উঠব সেও তথৈবচ। কোনো বিশেষ অসুখ আছে তাও নয়, জীবনের স্রোতটা থমথমে। বাইরের দিকে চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি, ঠিক যেন ঐ রোদ-পোহানো জাম গাছটার মতো। দুপুর বেলাকার আলোটা আমার মনের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানকার দিগন্তে সুদূর নীলাভ রেখা, আর সেখানকার ঝোপের মধ্যে কোথায় একটা ঘুঘু ডাকছে, প্রহর যাচ্ছে চলে। ঐ শূন্য মাঠের পর দিয়ে থেকে থেকে একটা ছিন্ন মেঘ যেমন তার ছায়া বুলিয়ে চলেছে, তেমনি কোন্ একটা দিশাহারা উড়ো বিষাদের ছায়া মনের উপর দিয়ে চলে যায়—মেঘেরই মতো খাপছাড়া—বাস্তব কিছুর সঙ্গেই জড়িত নয়।

এই পর্যন্ত কাল লিখেছি এমন সময় ডাক পড়ল। মেয়েরা ঋতুরঙ্গ অভিনয় করবে আজ সন্ধ্যেবেলায়। তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ওরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নক্শা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থটা

কী। আমাদের প্রতিদিনটা দাগ-ধরা, ছেঁড়াখোঁড়া, কাটা-কুটিতে ভরা, তার মধ্যে এর সংগতি কোথায়। যারা লোকহিত-ব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব সংসারে দুঃখ দৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন। তারা জানে "দরিদ্রনারায়ণ" তো নাচ শেখেন নি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলি ছটফট ক'রে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই। এরা এই কথাটা ভুলে যায় যে দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হোত তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগত না, এটাকে পাগলামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই সুসম্পূর্ণ রূপলীলাটি যখন দেখি তখন মন বলতে থাকে এই জিনিসটি অত্যন্ত সত্য—ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছন্নভাবে চারদিকে যা চোখে পড়তে থাকে তার চেয়ে অনেক গভীরভাবে নিবিড়ভাবে। পর্দাটার উপরেই প্রতিদিনের চলতি হাতের ছাপ পড়ছে, দাগ ধরছে, ধুলো লাগছে, পরিপূর্ণতার চেহারাটা কেবলি অপ্রমাণ হচ্ছে—একেই বলি বাস্তব। কিন্তু পর্দার আড়ালে আছে সত্য, তার ছন্দ ভাঙে না, সে অম্লান, সে অপরূপ। তাই যদি না হবে তবে গোলাপফুল ফুটে ওঠে কিসের থেকে, কোন্ গভীরে কোথায় বাজে সেই বাঁশি যার ধ্বনি শুনে মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে যুগে যুগে গান চলে এসেছে আর মনে হয়েছে মানুষের কলহ-কোলাহলের চেয়ে মানুষের এই গানেই চিরন্তনের লীলা। অঙ্গে অঙ্গে যখন নাচ দেখা দিল তখন ঐ ময়লা ছেঁড়া পর্দা-টার এক কোণা উঠে গেল—"দরিদ্র নারায়ণ"কে হঠাৎ দেখা

গেল বৈকুণ্ঠে, লক্ষ্মীর ডানপাশে। তাকেই অসত্য ব'লে উঠে চলে যাব, মন তো তাতে সায় দেয় না। দরিদ্র নারারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাঁকে লক্ষ্মীছাড়া ক'রে রাখব না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য, বিশ্বে এই দুইয়ের মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আবাহন করব যাঁরা "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ"। যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার নিত্যলীলা।

আর দুই একদিনের মধ্যেই আমাদের জাহাজের সঠিক খবর পেলে আমাদের গতিবিধির নিশ্চিত খবর তোমাকে জানাব। আজ আর সময় নেই। ইতি তারিখ ভুলেছি—ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০।

৪৮

তোমাকে চিঠি লিখছি কোপেনহেগেন থেকে, পড়েছি ঘূর্ণির মধ্যে। কোথাও একদণ্ড থামতে দিলে না। অপরিচিতের পরিচয় কুড়োতে কুড়োতে চলেছি কিন্তু সে পরিচয় সঞ্চয় ক'রে রাখবার মতো সময় নেই। তা ছাড়া আমার ভোলা মন, আমার স্মরণের ভাণ্ডারে তালা চাবি নেই—একটা কিছু যেই মজুদ হয়েছে অমনি আর একটা কিছু এসে তাকে সরিয়ে ফেলে। কিছু তলিয়ে যায়, কিছু দুমড়ে যায়; অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটাকে সম্পূর্ণ লোকসান ব'লে আক্ষেপ করব না, বর্জন করতে না পারলে অর্জন করা যায় না, জমাতে গেলে জমিয়ে বসতে হয়, নড়াচড়া বন্ধ। আমার মনোরথটাকে বহু কাল ধরে কেবলি চালিয়ে এসেছি, এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায়—গারাজে বন্ধ করে রাখবার সময়ই জুটল না। সঞ্চয়শালার দ্বারের সামনে গদিয়ান হয়ে বসতে যদি পারতুম তাহলে নামের বদলে বস্তু পাওয়া যেত বিস্তর। সামান্য কথাটা ভেবে দেখো না, মনে রাখবার মতো বুদ্ধি যদি থাকত তাহলে অন্তত পরীক্ষা পাসের পালা শেষ পর্যন্ত চুকিয়ে সংসারটাকে সেলাম ঠুকে এবং সেলাম কুড়িয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যেতে পারতুম। একটা কিছু বলতে যদি চাই তার রেফারেন্স দিতে পারিনে, পণ্ডিত সভায় বোকার

মতো কেবল নিজের বকুনি দিয়েই বিদ্যের অভাব চাপা দিয়ে রাখি। কাব্যালোচনা সভায় প্যারাফ্রেজ ও প্যারাল্যাল প্যাসেজ মাথায় জোটে না ব'লে কবিতা রচনা ক'রে নিজের মান রাখি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি পড়ে যাচ্ছ আর হাসছ মনে মনে এবং প্রকাশ্যে। বলছ এটা হোলো ফাঁকা বিনয়; অহংকারের বস্তা। উপায় নেই—সমাজনীতি অনুসারে সত্যের খাতিরে অন্যকে প্রশংসা করতে পারি নিজেকে নয়। আত্মস্তুতি মনে মনেই করতে হয় তাতে পাপ বাড়ে বই কমে না। আসল কথা, স্বদেশ থেকে বিদেশে এলেই আত্মগৌরব অত্যন্ত বেড়ে ওঠে। যার কপালে ঠাণ্ডা জলও জোটে না সে হঠাৎ পায় শ্যাম্পেন। তখন তোমাদের অধ্যাপক-মণ্ডলীকে ডাক দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, ওগো মাস্টারমশায়েরা, আমাকে তোমাদের ছাত্র ব'লে হঠাৎ ভ্রম কোরো না, আমি যে পেপারগুলো লিখেছি তাতে তোমাদের একজামিনেশন পেপার-এর মার্কা দিয়ো না, কেননা সেগুলো তোমাদের এখানকার অধ্যাপকেরা দাবি করেন। তুমি জানো আমি স্বভাবত বিনয়ী, স্বদেশী মাস্টাররা মেরে মেরে আমাকে অহংকারী ক'রে তুললে। এ জন্যে মনে মনে প্রায়ই লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলি তোমাকে, খ্যাতি সম্মান পেয়েছি প্রচুর, তবু মন ভারতসমুদ্রের পারের দিকে তাকিয়ে থাকে। শান্তিনিকেতন থেকে খুকু লিখেছে, "কাল খুব ঝমাঝম বৃষ্টি গেছে, আজ সকালে উঠেছে কাঁচা সোনার মতো রোদ"—ঐ কথা ক'টা যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলে,

মন ধড়ফড় ক'রে উঠল, বললে, আচ্ছা, তাই সই, যাব সেই অধ্যাপকবর্গে, তারা যদি আমাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেয় তবু তো খোলা জানলা দিয়ে কাঁচা সোনার মতো রোদ পড়বে আমার ললাটে, সেই হবে আমার বরমাল্য। ইতিমধ্যে ভানুসিংহের পত্রাবলী নতুন ছাপা হয়ে পড়ল আমার হাতে এসে। শান্তিনিকেতনের বর্ষার মেঘ ও শরতের রৌদ্রে পরিপূর্ণ সেই চিঠিগুলি। দূরদেশে এসে সেই চিঠিগুলি পড়ছি ব'লে সেগুলো এত পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গেলুম—কোথায় আছি। এত তফাৎ। এখানকার ভালো আর সেখানকার ভালোয় প্রভেদটা এখানকার সংগীত আর সেখানকার সংগীতের মতো। য়ুরোপের সংগীত প্রকাণ্ড এবং প্রবল এবং বিচিত্র, মানুষের বিজয়রথের উপর থেকে বেজে উঠছে। ধ্বনিটা দিগদিগন্তের বক্ষস্থল কাঁপিয়ে তুলছে। ব'লে উঠতেই হয়, বাহবা। কিন্তু আমাদের রাখালী বাঁশিতে যে-রাগিণী বাজছে, সে আমার একলার মনকে ডাক দেয় একলার দিকে, সেই পথ দিয়ে যে-পথে পড়েছে বাঁশবনের ছায়া, চলেছে জলভরা কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়ে, ঘুঘু ডাকছে আমগাছের ডালে, আর দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের সারিগান—মন উতলা ক'রে দেয়, চোখটা ঝাপসা ক'রে দেয় একটুখানি অকারণ চোখের জলে। অত্যন্ত সাদাসিধে, সেইজন্যে অত্যন্ত সহজ মনের আঙিনায় এসে আঁচল পেতে বসে। আমার নিজের সেদিনকার চিঠি যেন আমার আজকের দিনকে লেখা। কিন্তু জবাব ফিরিয়ে দেবার জো নেই;

সেদিনকার ডাকঘর বন্ধ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিঠি বন্ধ করা যাক। সামনে আছে যাকে বলে এনগেজমেণ্ট আর আছে ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতি ৮ অগস্ট্য, ১৯৩০।

৪৯

বাংলাভাষায় একটা শব্দ প্রচলিত হয়েছে, "সাময়িক পত্র" কিন্তু পত্রপুটে সময়কে ধরবার এবং পাঠাবার উপায় নেই। জর্মনিতে যখন আমার ছবির আসর জমেছিল তার সংবাদ পৌঁছেছে কবে জানিনে—অথচ আজ তোমার চিঠিতে যখন জানলুম ছবির খবর তোমরা পাওনি তখন সেই খবরের সময়ও নিশ্চয় পেরিয়ে গেছে। এদিকে আজ আমার জর্মনির পালা সাঙ্গ হোলো, কাল যাব জেনিভায়। এ পত্র পাবার অনেক আগেই জানতে পেরেছ যে জর্মনিতে আমার ছবির আদর যথেষ্ট হয়েছে। বর্লিন ন্যাশনাল গ্যালারি থেকে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েছে। এই খবরটার দৌড় কতটা আশা করি তোমরা বোঝো। ইন্দ্রদেব যদি হঠাৎ তাঁর উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া পাঠিয়ে দিতেন আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে তাহলে আমার নিজের ছবির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতুম। কিন্তু এ সব কথা আমার আলোচনা করবার উৎসাহ হয় না—কে জানে কেন। বোধ হয় আমার মনের ভিতরে একটা বৈরাগ্য আছে. আমাদের দেশের সঙ্গে আমার চিত্র-ভারতীর সম্বন্ধ নেই ব'লে মনে হয়। কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো রং বলো কোনো বিশেষ

প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। অতএব এ জিনিসটা যারা পছন্দ করে তাদেরই, আমি বাঙালি ব'লে এটা আপন হতেই বাঙালির জিনিস নয়। এইজন্যে স্বতই এই ছবিগুলিকে আমি পশ্চিমের হাতে দান করেছি। আমার দেশের লোক বোধ হয় একটা জিনিস জানতে পেরেছে যে আমি কোনো বিশেষ জাতের মানুষ নই; এইজন্যেই ভিতরে ভিতরে তারা আমার প্রতি বিমুখ, কটূক্তি করতে তাদের একটুও বাধে না। আমি যে শতকরা একশো হারে বাঙালি নই, আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও এই কথাটারই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।

অনেক পূর্বপরিচিত জায়গা দিয়ে ঘুরে এলুম, তেমনি করে বক্তৃতাও দিয়েছি। কিন্তু এই যাত্রায় আগের বারের চেয়ে জর্মনির অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে আমার প্রবেশাধিকার ঘটেছে। ওদের কাছাকাছি এসেছি। এদের মধ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বজাতীয়তা আছে তা নয়, য়ুরোপের অন্য সকল জাতের হাতের ঠেলা খেয়ে এরা ভিতরে ভিতরে খুব কঠোরভাবেই ন্যাশানালিস্ট হয়ে উঠেছে। অথচ আমার উপরে এদের একটা বিশেষ প্রীতি কেন আছে ঠিক ভেবে পাইনে। আর যাই হোক অসামান্য এদের শক্তি, প্রকাণ্ড এদের বুদ্ধি, তা ছাড়া সব জিনিসকে সমষ্টীকরণের ক্ষমতা এদের আশ্চর্য। আমার তো মনে হয় য়ুরোপের কোনো জাতেরই সকল বিষয়েই এত বেশি জোর নেই। জর্মনির বিভীষিকা ফ্রান্সের মনে কিছুতেই যে ঘুচতে চায় না তার মানে বুঝতে পারি।

এরা ভয়ংকর এক-রোখা। দারিদ্র্যের ঠেলা খেয়েই এদের শক্তি আরো যেন দুর্দম হয়ে উঠেছে।

বিশ্বজাতীয়তার উদ্যম সজ্ঘীভূত হয়ে উঠেছে জেনিভায়। লীগ অফ নেশনে ঠিক সুর বাজেনি—হয়তো বাজবেও না—কিন্তু আপনা আপনিই ওই শহর সমস্ত জগতের মহানগরী হয়ে উঠছে। যাদের প্রকৃতি বিশ্বপ্রাণ তারা আপনা আপনি ঐখানে এসে মিলবে। ঐ ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের একটা মহাকল্যাণ-শক্তির উদ্বোধন ঘটছে ব'লে আমার বিশ্বাস। ইতি ১৮ আগস্ট, ১৯৩০।

৫০

যাই যাই করতে করতে এতদিন পরে যাবার সময় কাছে এল। প্রায় একবৎসর কাটবে। যতদিন য়ুরোপে ছিলুম লাগছিল ভালো। আমেরিকায় গিয়ে মনটা যেন চাপা পড়ল, শরীরেও খুব একটা ধাক্কা লেগেছিল। আমেরিকায় বাইরে ব'লে পদার্থটা বড়ো বেশি উগ্র এবং চঞ্চল, কিছুদিন নিরন্তর নাড়া খাওয়ার পরে ভারি একটা বৈরাগ্য আসে। আমি সেই অবস্থায় আছি, অন্তরের মধ্যে আশ্রয় পাবার জন্যে কিছুকাল থেকে একটা ব্যাকুলতা লেগে আছে। নানান কাণ্ডকারখানা নিয়ে চিত্ত আমার বহির্মুখ হয়ে পড়েছিল, নিজের সত্য যেখানে, সেখানকার তালা চাবিতে মরচে পড়ে আসছিল। এমন সময় আমেরিকায় এসে চোখে পড়ল মানুষ কতই অনাবশ্যক ব্যর্থতায় সমাজকে একঝোঁকা ক'রে তুলেছে, আবর্জনাকে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে সাজিয়েছে, আর তারি পিছনে দিনরাত্রি নিযুক্ত হয়ে আছে, পৃথিবীর বুকের উপর কী অভ্রভেদী বোঝা চাপিয়েছে। এই সমস্ত জবড়জঙ্গের বিষম ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাণ যখন অস্থির হয়ে ওঠে তখন ভিতরকার মানুষের চিরন্তনের দাবি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সন্ধ্যাবেলায় ধেনুকে গোষ্ঠে ফেরাবার মতো নিজের ছড়িয়ে-পড়া আপনাকে আপনার গভীরের মধ্যে প্রত্যাহরণ ক'রে

আনার জন্যে ডাক দিচ্ছি। হয়তো জীবনের অপরাহ্ণের উপর প্রদোষের ছায়া নেমেছে, মনের যে শক্তি নিজের উদ্যমকে বাইরের নানা কাজে নানা দিকে চালান করে দিয়েছিল তার মেয়াদ শেষ হয়ে এল—দেউড়ির দ্বারী সদর দরজা বন্ধ করবে ব'লে ঘণ্টা দিয়েছে, অন্দরমহলে দীপ না জ্বাললে আর চলবে না।

অনেকদিন কিছু লিখিনি—লিখতে ইচ্ছেই করে না—তার মানে প্রকাশ করবার শক্তি পরিশিষ্টে এসেছে; তার তহবিলে বাড়তির অংশ নেই ব'লেই সহজেই সে বাইরের বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে—অথচ সেটা খারাপ লাগছে না—ভিতরে ফল যদি ধরে তবে ফুলের পাপড়ি ঝরলে লোকসান নেই।

আগামী ৯ই জানুয়ারিতে নার্কণ্ডা জাহাজে (P. & O.) যাত্রা করব মাসের শেষে পৌঁছব দেশে। ইতি ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩০।

৫১

যেটা আমার নিত্য কাজ এতদিন পরে দেখছি সেটাতে আমার মন বসছে না। মন চঞ্চল হয়েছে ব'লেই যে এটা ঘটল তা নয়, মন স্তব্ধ হয়েছে ব'লেই বাহিরের তাড়ায় সে আর আগের মতো সাড়া দিতে চায় না। ডুবো জাহাজ থেকে মাল তোলবার একটা ব্যবসা আছে, সেই কাজের ডুবারীর মতো অবকাশের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে নিজের সমস্ত ডুবে যাওয়া দামী দিনগুলিকে উদ্ধার করে আনবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠছে। অন্য সব কাজের পক্ষে যে উদ্যম আবশ্যক তার তেজ বোধ করি ক্রমেই কমে এল তাই এই গোধূলির আলোয় নিজের অন্তরতর সঙ্গলাভ করবার জন্যে মনটা আজ আত্মনিবিষ্ট হয়ে আছে।

শরৎকালের মতো ভাবগতিক। মেঘও আছে স্তূপে স্তূপে, রৌদ্রও আছে খরতর, দুটোই একসঙ্গে। শ্রাবণ তেড়ে এসে এক একদিন নিজেকে সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করে, খুব ঝমা-ঝম বৃষ্টি পড়ে, মাঠ ভেসে যায়, বড়ো বড়ো গাছগুলো তাদের অচল গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে মাতামাতি করতে থাকে। তার পরেই দেখি পালা শেষ হয়ে যায়, আকাশ কে যেন নিকিয়ে দিয়ে গেল, শূন্য আকাশটায় জাজিম বিছিয়ে দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ এসে দখল জারি করে। চেয়ে চেয়ে দেখি, আর এক

একবার মনের মধ্যে এই কথাটা আসে, যে, এই রকম দেখে নেওয়াটা দুর্লভ।—ভিতর থেকে কে এই সব দেখিয়ে দিলে এই সত্তরটা বছর—কত চলতি মুহূর্তের খেয়ায় বোঝাই করা কত আশ্চর্যরকমের যোগাযোগ।

তোমরা কি এবারকার হপ্তাশেষের রেলপথে এ অঞ্চলে আসছ। একটা জরুরি কাজে প্রশান্তকে ডেকেছিলুম। ইতি ১৮ শ্রাবণ, ১৩৩৮।

৫২

মেঘদূতের মন্দাক্রান্তাছন্দে বৃষ্টিবাদল হয়ে গেল কিছুদিন। বৈশাখের রৌদ্রকে কালো ভিজে ব্লটিং চাপা দিয়ে শুষে নিয়েছিল। দুদিন ফাঁক পড়তেই বৈশাখ আবার আকাশে বাগিয়ে বসেছিল তার আগুন রংএর চিত্রপটখানা, তার জ্বলন-লেপা তুলি নিয়ে। আজ আবার দেখি দিগন্তের প্রাঙ্গণে মেঘদূতের উঁকি ঝুঁকি কানাকানি। এ বছরটার গ্রীষ্মের আসরে দুইপক্ষে বোধ করি এই রকম ছড়াকাটাকাটি চলবে। তবে আর পাহাড় পর্বতের দিকে ছুটোছুটি করব কিসের প্রত্যাশায়।

ঠিক যে সময়ে বৃষ্টি আসন্ন এমন একটা লগ্ন দেখে যদি আসতে পারো তাহলে তাপ বা পরিতাপ বোধ করবে না। আগামী অমাবস্যার ডাক পড়েছে, চাঞ্চল্য তাই দেখছি আকাশে —শ্যামলের মজলিস জমবে বোধ হচ্ছে। দেখে রৌদ্রতপ্ত আঁখি জুড়িয়ে যাবে। আর এক দফায় পাঁচ পয়সার খরচ লিখলুম খাতায়। ইতি ৮ বৈশাখ, ১৩৩৯।

৫৩

গাছপালাগুলো দুলছে—হাওয়া দিয়েছে পশ্চিমের দিক থেকে। রোদ্দুরে সোনার রং ধরেছে। এই রংটাতে মন ভোলায়—অনির্দিষ্ট কোন্ সুদূরের জন্যে মন কেমন করে। মানুষের মন দুইবাসার পাখি, একটা কাছের বাসা, একটা দূরের। শরৎকালটা হচ্ছে দূরের কাল—আকাশের আবরণটা উঠে গেছে কিনা, আর যে আলোটা সমস্ত ভাবনাকে রাঙিয়ে তোলে, সেটা যেন দিগন্তপারের প্রাসাদবাতায়ন থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আসছে, আর তারি সঙ্গে ভেসে আসছে একটি অশ্রুত ধ্বনির সানাইয়ে মূলতানের আলাপ। এখন বেলা তিনটে হবে—রথী বৌমা পুপে, এই ট্রেনে যাত্রা করছে দার্জিলিঙের উদ্দেশে। আজ ছুটি-পাওয়া ছেলেমেয়ের দলও চলল বাড়িমুখে। আজ অপরাহ্নের আকাশে এই যানে-ওয়ালাদের স্রোতের টান ধরেছে—মনে হচ্ছে ঐ শিউলিগাছ-গুলোও উন্মনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দুটো একটা চল্‌তি মেঘের দিকে তাকিয়ে। মনকে বোঝাচ্ছি, কর্তব্য আছে,—কিন্তু আজ এই দিগন্তব্যাপী ছুটির বেলায় কর্তব্যটা উজোনের নৌকো, গুণ টেনে হাঁপিয়ে মরতে হবে—প্রাণটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ছুটির ঘণ্টা বাজছে আমার বুকের মধ্যে, শিরায় শিরায় রব উঠছে দৌড় দৌড় দৌড়। কিন্তু হায়রে, আমার

বয়েস আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধেছে—স্থাবর শক্তিকে নড়াতে গেলে অনেক টানাটানির দরকার, ফস্ ক'রে কোমর বেঁধে বেরিয়ে পড়লেই হোলো না। তাই ডাঙার বটগাছের মতো মস্ত ছায়া মেলে তাকিয়ে দেখছি, ঢেউগুলো লাফ দিয়ে দিয়ে চলেছে রৌদ্রে ঝিল্‌মিল্ করতে করতে—তাদের সঙ্গে সুর মেলাতে চায় আমার অন্তরের মর্মরধ্বনি—কিন্তু তাতে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সুর লাগে। আমিও তো যানে-ওয়ালা, কিন্তু আমার যাত্রা একান্ত ডুবে যাওয়ার দিকে, সামনের পথে ছুটে যাওয়ার দিকে নয়। ছুটির এই চঞ্চলতা কাল পরশুর মধ্যেই শান্ত হয়ে যাবে, তখন মনের পালে উদাস হাওয়ার বেগ যাবে কমে, তখন কর্মহীন প্রহরগুলোর স্তব্ধতার মাঝখানে বসে ওই বিলিতি নিমের নিঃশব্দ বীথিকার দিকে চুপ করে চেয়ে থাকবার সময় আসবে।

অভিনয়ের খবর দিতে অনুরোধ করেছিলে তারি ভূমিকাটা লেখা হোলো। অভিনয়টা হয়ে চুকে গেছে এই খবরটাতেই মন আছে ভরে। ওস্তাদজি গান বন্ধ করলেন—এসরাজের তার দিলে আল্‌গা করে, বন্ধ রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা সব খুলে ফেলেছে—ছেলেরা প্রায় কেউ নেই, কুকুরগুলো আসন্ন উপবাসের উদ্বেগ মনে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আসল খবরটা দিয়ে ফেলি। ভালোই হয়েছিল অভিনয়, দেখলে খুশি হোতে, মেয়েরা নাচেনি, নেচেছিল ছেলেরা, সেটা পীড়াজনক হয়নি।

বৌমা পুপে বিদায় নিয়ে গেল। হঠাৎ আজ লাল এসে পৌঁছেছে, তাই রথী আজ যেতে পারলে না—কাল যাবে ব'লে জনরব। তোমার ঘরে সঙ্গের অভাব নেই—মিস্ত্রিদের নিয়ে দিন ভরতি হয়ে আছে। কবে যাবে গিরিডিতে।

৩ অক্টোবর, ১৯৩২।

৫৪

মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতালার নিভৃত ঘরটি—আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে—পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রেখা, আর গুণটানা মাস্তুল। দিনগুলো অবকাশে ভরা—সেই অবকাশের উপর প্রজাপতির ঝাঁকের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে রঙিন পাখাওয়ালা কত ভাবনা এবং কত বাণী। কর্মের দায়ও ছিল তারি সঙ্গে—আর হয়তো মনের গভীরে ছিল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, পরিচয়হীন বেদনা। সব নিয়ে ছিল যে আমার নিভৃত বিশ্ব সে আজ চলে গিয়েছে বহুদূরে। এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে ছিল আমার পরিণত যৌবন—কোনো ভারই তার কাছে ভার ছিল না—নদী যেমন আপন স্রোতের বেগেই আপনাকে সহজে নিয়ে চলে, সেও তেমনি আপনার ব্যক্ত অব্যক্ত সমস্ত কিছুকে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চলেছিল—যে ভবিষ্যৎ ছিল অশেষের দিকে অভাবনীয়। এখন আমার ভবিষ্যৎ এসেছে সংকীর্ণ হয়ে। তার প্রধান কারণ যে লক্ষ্যগুলো এখন আমার দিনরাত্রির প্রয়াসগুলিকে অধিকার করেছে তারা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। তার মধ্যে অচরিতার্থ অসম্পূর্ণ আছে অনেক কিন্তু অপ্রত্যাশিত নেই। এইটেতেই বোঝা যায় যৌবন দেউলে হয়েছে, কেন না যৌবনের প্রধান সম্পদ হচ্ছে অকৃপণ ভাগ্যের অভা-

বনীয়তা। তখন সামনেকার যে অজানা ক্ষেত্রের ম্যাপ আঁকা বাকি ছিল, মাইলপোস্ট বসানো হয় নি সেখানে, সম্ভবপরতার ফর্দ তলায় এসে ঠেকেনি। আমার শিলাইদহের কুঠি পদ্মার চর সেখানকার দিগন্ত-বিস্তৃত ফসল খেত ও ছায়ানিভৃত গ্রাম ছিল সেই অভাবনীয়কে নিয়ে, যার মধ্যে আমার কল্পনার ডানা বাধা পায় নি। যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলাম তখন সেই কাজের মধ্যে অনেকখানিই ছিল অভাবনীয়, কর্তব্যের সীমা তখন সুনির্দিষ্ট হয়ে কঠিন হয়ে ওঠেনি, আমার ইচ্ছা আমার আশা আমার সাধনা তার মধ্যে আমার সৃষ্টির ভূমিকাকে অপ্রত্যাশিতের দিকে প্রসারিত ক'রে রেখেছিল—সেই ছিল আমার নবীনের লীলাভূমি—কাজে খেলায় প্রভেদ ছিল না। প্রবীণ এল বাইরে থেকে, এখানে কেজো লোকের কারখানাঘরের ছক কেটে দিলে, কর্তব্যের রূপ সুনির্দিষ্ট ক'রে দিলে, এখন সেইটের আদর্শকে নিয়ে ঢালাই পেটাই করা হোলো প্রোগ্রাম—হাপরের হাঁপানি শব্দ উঠছে, আর দমাদম চলছে হাতুড়িপেটা। যথা-নির্দিষ্টের শাসন আইনেকানুনে পাকা হোলো, এখানে অভাবনীয়কেই অবিশ্বাস ক'রে ঠেকিয়ে রাখা হয়। যে পথিকটা একদিন শিলাইদহ থেকে এখানকার প্রান্তরে শাল-বীথিচ্ছায়ায় আসন বিছিয়ে বসেছিল তাকে সরতে সরতে কতদূরে চলে যেতে হয়েছে তার আর উদ্দেশ মেলে না—সেই মানুষটার সমস্ত জায়গা জুড়ে বসেছে অত্যন্ত পাকা গাঁথুনির কাজ। মাঝখানে পড়ে শুকিয়ে এল কবির যৌবন, বৈশাখে

অজয় নদীর মতো। নইলে আমি শেষদিন পর্যন্তই বলতে পারতুম আমার পাকবে না চুল, মরব না বুড়ো হয়ে। জিৎ হোলো কেজো লোকের। এখন যে কর্মের পত্তন তার পরিমাপ চলে, তার সীমানা সুস্পষ্ট, অন্য বাজারের সঙ্গে তার বাজারদর খতিয়ে হিসাব মিলবে পাকা খাতায়। মন বলছে, "নিজবাসভূমে পরবাসী হোলে।" এর মধ্যে যেটুকু ফাঁকা আছে সে ঐ সামনে যেখানে রক্তকরবী ফোটে, সেদিকে তাকাই আর ভুলে যাই যে, পাঁচজনে মিলে আমাকে কারখানা-ঘরের মালিকগিরিতে চেপে বসিয়ে দিয়ে গেছে। ইতি ৮ই এপ্রেল, ১৯৩৫।

৫৫

ব্যালাটন ফ্যুরেডের ছবিটির উপরে কালের দূরত্বের ছায়া আছে। অনুভব করলুম তখনকার ঘাট থেকে পাড়ি দিয়ে যে পরপারের কাছে এসে পৌঁছেছি সেখান থেকে ঐ দিনকার দৃশ্য স্বপ্নের মতো দেখায়। এক জীবনের মধ্যেই কত জন্মান্তর ঘটে সেই কথাই ভাবি। সেদিনকার বাগান থেকে হয়তো ফুল সঙ্গে আনা যায় কিন্তু সেই বাগানের পথটা লুপ্ত। পরিবর্তমান সময়ের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে চলতে হবেই, অতীতের সঙ্গে পদে পদে হিসেব চুকিয়ে না দিয়ে উপায় নেই। সেই হিসাবের পুরানো খাতাটা মাঝে মাঝে হাতে পড়ে কিন্তু পুরানো তহবিলটার উপর দাবি খাটে না। পিছন থেকে কেবলি ধাক্কা আসছে, চলো, চলো, নিজের রাস্তা নিজে রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না। চলেইছি, চলেইছি, পিছনের দিগন্তে পথচিহ্নগুলো একে একে ঝাপসা হয়ে আসছে।

রাজার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা-নৃত্যাভিনয়ের মহড়া সমানই চলছে। খুব ভালো লাগছে। আর সবই অস্পষ্ট অবাস্তব ঠেকতে পারে কিন্তু আর্ট জিনিসটাকে সত্য অত্যন্তই মানতে হয়। কেননা তার তো বয়স নেই—আমাদের প্রাত্যহিক সংসারের খাঁচায় তার বাস নয়, অমরাবতীর আকাশে চলে সে রঙিন পাখা মেলে, মনটা যতক্ষণ সওয়ার

হয়ে থাকে তার পিঠে, ততক্ষণ ভুলে থাকে আপন ধুলোর রাস্তায় ভ্রমণের ক্লান্ত ভাগ্যকে।

জিজ্ঞাসা করেছ কবে কলকাতায় যাব। হয়তো ৬ই ফেব্রুয়ারি অথবা তারি কাছাকাছি কোনোসময়ে। নিশ্চিত তারিখটা বলার অভ্যেস আমার কোনোকালে নেই, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট খবর জানলেও সেটা অস্পষ্ট হয়ে আসে। চিঠিতে আন্দাজে আমি তারিখ বসিয়ে দিই—সেই আন্দাজের বহর অনেক সময়ে খুব মস্ত। অতএব ব'লে রাখলুম আমার চিঠিকে কখনো গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার কাজে লাগিয়ো না। ইতি বোধ করি ২২ জানুয়ারি, ১৯৩৬।

———

৫৬

তথাস্তু। চললুম। কলকাতায় এক আধদিন কাজ আছে —আরো বেশি কাজ আছে শান্তিনিকেতনে। দশ হাজার টাকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত বিচলিত হইনি। এ পর্যন্ত আমার কুষ্ঠিতে ব্যয়ের স্থানের চঞ্চলতা। আয়ের সংবাদ নিয়ে যাঁরা আনন্দ করবেন তাঁদের সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। টাকাটাও পূর্বপ্রতিশ্রুত অতএব প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে নূতন পুলক-সঞ্চারের কারণ নেই। ইতিমধ্যে কা—মসুরি থেকে আমার দর্শনের জন্যে এসে দুদিন কাটিয়ে গেছেন। তাঁর দুঃখের দিনে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পেরেছিলুম, সে কথা ভুলতে পারেন নি —এইটেই আমার যথার্থ পুরস্কার। দৈব সুযোগে এমন কিছু দিতে পারা যায় প্রতিদান অক্ষয় হয়ে থাকে, শ্রদ্ধা যার ম্লান হয় না। যখন কোনো উপলক্ষে আবিষ্কার করা যায় যে আমার কিছু সম্পদ আছে যা বিশুদ্ধভাবে দানেরই জন্য, তখন নিজের সেই মূল্য উপলব্ধি করে কৃতজ্ঞ হই ভাগ্য-বিধাতার কাছে। অন্যকে দান করতে পারাই সব চেয়ে বড়ো দান নিজের প্রতি। হয়তো এই দানের ধারা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে কিছু কিছু প্রবাহিত হয়ে থাকবে—কিন্তু সেটা অত্যন্ত বেশি নৈর্ব্যক্তিক। প্রত্যক্ষ কৃতজ্ঞতার দীপ্তি তাতে অন্তরালে পড়ে, তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে খ্যাতি নিন্দার

বিচার। তাতে আমার লোভ ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মানুষের বুদ্ধির যাচাইয়ের চেয়ে মানুষের হৃদয়ের অর্ঘ্য অনেক বেশি মূল্যবান। সেটাকেও যেন আত্মদানের সহজ পন্থা দিয়েই পাওয়া সম্ভব হয়—তার জমা ওয়াসিল বাকির খাতাটা যেন চিতাভস্মের পূর্বেই সম্পূর্ণ ভস্মসাৎ হোতে পারে এই কামনা করছি।—পর্শু যাব আমরা। বিদায়কালের দিনগুলি মধুর হয়ে উঠেছে। বসন্তকালের মতো আতপ্ত, শরৎকালের মতো নির্মল। নীল আকাশে বরফের পাহাড়গুলি অত্যন্ত একটি কোমল শুভ্রতা ও লাবণ্য বিস্তার করেছে। এর থেকে যে ভাষা প্রকাশ পায় কোনোমতেই তার উত্তর দিতে পারি নে। কত অল্পই বলা হয়েছে। সেই অকথিত বেদনা কি সঙ্গে থেকে যাবে। ইতি ২৪।৬।৩৭

———

৫৭

তুমি রেগে বসে আছ বরানগরে, আর আমি রেগে বসে আছি শান্তিনিকেতনে। মাঝখানে ৯৯ মাইলের ব্যবধান ব'লে কোনো অপঘাতের সম্ভাবনা নেই। তোমরা মেয়েরা আজ-কাল কাগজে প্রায় নিজেদেরই দয়ামায়াপ্রবণ চিত্তবৃত্তি এবং মাতৃধর্ম নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে ব্যস্ত আছ, তা না করে যদি অবসর মতো তুই একখানা দেড় পৃষ্ঠা আন্দাজ চিঠি লিখতে তাহলে রোগতুঃখসন্তপ্ত সংসারে অনেকখানি সান্ত্বনা দিতে পারতে। চার পয়সা দামের একখানা প্রশ্ন যে, শরীরটা আছে কেমন, তার সঙ্গে তুটো লাইন অত্যুক্তি জুড়ে দেওয়া যে, খবর না পেয়ে উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করছি—এর মূল্য চার পয়সা ছাড়িয়ে কত সংখ্যায় গিয়ে পৌঁছয় তার সীমা নেই।— আমার বোলপুরযাত্রার প্রথম দিনকার খবরটা বিবৃতির যোগ্য। সেক্রেটরি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, রস্থলপুর— বলতে বলতে তুই চক্ষু ভাবাবেশে মুদে এল। পৌঁছলুম রস্থলপুরে, অপরাহ্ণের রৌদ্রে বেনারসির সাড়ির আঁচলা জড়িয়ে দিয়েছে বনশ্রীর শ্যামলচিক্কন দেহ ঘিরে। এ কথা সত্য যে রেল-ডিঙোনো উর্ধ্বসেতুর ঔদ্ধত্য নেই সেখানে। পদচালনা করে স্টেশন ঘর পর্যন্ত যেতে যেতে মনে হোলো বুক বিদীর্ণ হয়ে যাবে। শেষের দশ পা বাকি থাকতে পড়ে গেলুম অসমর্থ দেহে। এই প্রথম পতন—শেষ পতনে গিয়ে পৌঁছবার

উপক্রমণিকা। একটা চৌকিতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে, দেহমর্যাদানাশের দৃশ্যে হেসে উঠতে পারে, এমন রসিকা নারী তখন কেবলমাত্র উপস্থিত ছিলেন আমার ভাগ্যদেবী। এর থেকে বুঝতে পারবে শরীরের উপর অকুণ্ঠিত মনে নির্ভর করবার দিন আমার গেছে—বিশ্বাসঘাতক হঠাৎ একদিন নিশ্বাসঘাতকতা করবে ব'লে সন্দেহ হচ্ছে। করুণ হৃদয়ে উৎকণ্ঠা উৎপাদনের আনন্দ সম্ভোগ করবার ইচ্ছায় খবরটা বিস্তারিত করে জানালুম। আশা করি যথোচিত দুঃখ বোধ করবে—এই দুঃখ, রাগের তাপ নিবারণের বেলেস্তারার কাজ করতেও পারে।

বাষ্পভারমন্থর বাতাসের মধ্যে আবৃত হয়ে আছি—রাত্রে যখন সুখনিদ্রার প্রত্যাশা ত্যাগ করতে হয় তখন একাধিক সহস্র রজনীর আয়োজনের কথা স্মরণ করে মন লুব্ধ হয়—ঘন ঘন হাত পাখা সঞ্চালন করে দুরাশাটাকে উড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করি।—এঞ্জিন যায় বিগড়িয়ে, মনটা তার সঙ্গে যোগ দেয়।

তোমাদের বরানগরের নতুন বাসায় আমার স্থান সংকুলান হবে এ কথাটা মনে রাখলুম। স্থান হয় তো অবসর হয় না—সুযোগ বিদ্রূপ করতে থাকে—উপরের দিকে কল খুলে দেয়, ঘড়ার তলায় রেখে দেয় ছেঁদা। কোনো একসময়ে দেশ কালপাত্রের সামঞ্জস্য হবেই। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি ৯ই জুলাই, ১৯৩৭।

৫৮

নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে আমি যেন সপ্তম শতাব্দীর একটা ভগ্নাবশেষ—অধিকাংশ মহলটাই কাজের বার হয়ে গেছে, কেবল একটা অংশে শেলাই করা চট আর কেরোসিনের টিনে মিলিয়ে একটা বাসা তৈরি করা আছে, উইয়ে কাটা প্যাক বাক্সের উপরে বসে আছি। বসে বসে চেয়ে আছি বাইরের দিকে—গরমে ফলের গুটি-ঝরে-পড়া আম গাছ ছেয়ে গেছে নিবিড় কচি পাতায়; ফুলের অর্ঘ্য আকাশের দিকে তুলে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে পাতাহীন গোলক-চাঁপার আঁকা বাঁকা ডালের গাছ, লাল কাঁকরের রাস্তার ধারে অশোক গাছ দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর প্রথম অশোকগুচ্ছ ধরিয়েছে ঐ কাঁকরেরই মতো ঘন লাল রঙের। আমার এই জীর্ণ দেহের জানলার ফাঁক দিয়ে এখনো মোকাবিলা চলেছে বাইরের জগতের সঙ্গে, কিন্তু মনে হচ্ছে ওর উপরে ক্রমে আড়াল করে আসছে একটা ঝুঁকে পড়া ভাঙা ছাত। অকস্মাৎ দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হোতে আরম্ভ করেছে। শেষ বয়সে মস্তিষ্ক যখন ক্লান্ত হবে তখন ছবি এঁকে দিন যাবে এই ভরসা করে ছিলুম কিন্তু সন্দেহ ধরিয়ে দিয়েছে। বাইরের সঙ্গে আনাগোনার রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আপন অন্তর্লোকে নির্জনবাসের একটা পালা আরম্ভ হবে,

হয়তো তাতে মৃত্যুর উপক্রমণিকার একটা অভিজ্ঞতা লাভ করব—হয়তো তারো একটা কোনো রকমের সার্থকতা আছে—আগাম কল্পনায় যে শূন্যতার আশঙ্কা করি সেটা হয়তো মিথ্যা। কিন্তু যেটা মনে করতে সকলের চেয়ে খারাপ লাগে সে হচ্ছে দেহযাত্রায় পরের উপর নির্ভরতা ;—আশা করি এঞ্জিন একেবারে বিগড়বার পূর্বেই শেষ টর্মিনাসে এসে থামব ; অসমাপ্ত পথের মাঝখানে ঠেলাগাড়ির জন্যে কুলি ডাকতে হবে না।

খুবই গরম। কিন্তু গরম নিয়ে নালিশ করতুম না যদি আমার চোখের দুর্বলতার জন্যে ঘর অন্ধকার করে থাকতে না হোত। জীবনে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নকে এই প্রথম দরজার বাইরে খেদিয়ে রেখেছি। ইতি ৩১।৩।৩৮

৫৯

নির্মল নীল আকাশ, কাঁচা সোনা-রঙের রোদ্দুর, পাতলা রেশমি চাদরে ঢাকা ছোটো পাহাড়গুলির ঊর্ধ্বে নগাধিরাজের তুষার-কিরীটি মহিমা, মহাদেবের ধ্যানোদ্দীপ্ত শুভ্র ললাট। আমাদের কাছের অধিত্যকার বনে বনে স্নিগ্ধ চিক্কণ পুঞ্জীভূত সবুজে লেগেছে পরশমণির স্পর্শ, পাতায় পাতায় জেগেছে সোনার রোমাঞ্চ, নীল নিস্তব্ধতার উপর পাখিদের মিশ্রিত কাকলী নীলাম্বরী কাপড়ের উপর জরির কাজের মতো ঝিলি মিলি করছে। এইমাত্র খেয়ে উঠলুম, একটা আম, গোটা-কতক লিচু, টোস্ট করা রুটি, পাহাড়ী গোষ্ঠের মাখনে আর পাহাড়ী মৌচাকের মধুতে লিপ্ত। এসে বসেছি মুক্তদ্বার ঘরে। প্রচুর আলোতে আমার মন গিয়েছে তলিয়ে, আমার উড়ো ভাবনা ঝাপসা বেগনি কুহেলিকায় অস্পষ্ট, কর্তব্যবুদ্ধিটা যেন নেশা করে ভোলানাথ হয়ে বসে আছে। ঈর্ষা হচ্ছে না? সেইজন্যেই লেখা। কালিম্পঙ, ১৪ই মে, শনিবার, ১৯৩৮।

৬০

গত কালকার চিঠির প্রান্তে তোমাকে যা লিখেছিলুম তার সংক্ষেপ মর্ম এই, আরামের চরম আরাম হচ্ছে অন্যের অনারাম উপলব্ধি করে। এই ধরণের একটা ইংরাজি বচন আছে, তাতে কবি বলেছেন দুঃখের চূড়ান্ত দুঃখ হচ্ছে সুখীতর দিনকে স্মরণ করা। পূর্ববাক্য আজ আমি চার পয়সা খরচ ক'রে শোধন করতে চাই—বলতে চাই আরামের পরম আরাম হচ্ছে অন্যকে সেই আরামের শরীক করতে ডাক দেওয়া, এর থেকে যা বোঝো তাই বুঝো। দেবতার সোনার রঙের মদের পাত্র ভোর থেকে উলটে পড়ে গেছে—মাতাল হয়ে উঠল গাছপালাগুলো, নীল আকাশের চোখে লেগেছে বিহ্বলতা, আর ক্ষীণ-কুয়াশায় আবছায়া করা পাহাড়গুলোর গদগদ ভাষা। একটা কথা ব'লে রাখি ধ্বনি প্রেরণ করি প্রতিধ্বনির প্রত্যাশায়, তা মনে কোরো না। বাচালতা যাদের স্বধর্ম তাদের বকুনি অহৈতুক আবেগে। বাইরে থেকে এর মজুরি সব সময় মেলে না, দরকারও নেই।

১লা কিংবা ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫।